রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে নর-নারী সম্পর্ক

রীতা রানী সাহা

Dhaka University Library
400851

400851

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
জানুয়ারি ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে নর-নারী সম্পর্ক

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর সিদ্দিকা মাহমুদা
অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রীতা রানী সাহা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৮,শিক্ষাবর্ষ : ১৯৯৭-৯৮
বাংলাবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ পৌষ ১৪০৯
০৮ জানুয়ারি ২০০৩

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রীতা রানী সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে নর-নারী সম্পর্ক' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

ড. সিদ্দিকা মাহমুদা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

উনিশ শতকের নতুন শিল্প-আঙ্গিক সমূহের মধ্যে অন্যতম শাখা-ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শাখার জনয়িতা ও রূপকার । তাঁর গল্পগুচ্ছে নর-নারী সম্পর্কের বিচিত্র রূপ এবং রূপান্তর লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে পাওয়া যায়না। তবে কোন কোন সমালোচনা গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ কারণে আমার এম ফিল গবেষণার অভিসন্দর্ভ হিসেবে এ বিষয়টি নির্বাচন করেছি। সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন কীভাবে মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ঘটায়, নর-নারী সম্পর্কের রূপান্তর সাধন করে, তার স্বরূপ উন্মোচনই বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়।

'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে নর-নারী সম্পর্ক' শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে উপসংহার ব্যতীত চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রথম পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক, তৃতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক, চতুর্থ অধ্যায়: তৃতীয় পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক।

নর-নারী সম্পর্কের স্বরূপ রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে যেহেতু স্থির থাকেনি, তাই কালের পরিবর্তনের সাথে মানুষের এ পরিবর্তনের একটি ঐক্য অনুসন্ধান করা হয়েছে এ অভিসন্দর্ভে । এ কারণে প্রকাশকাল এবং চরিত্রলক্ষণের দিক থেকে গল্পগুচ্ছের গল্পসমূহকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়: ক. উনবিংশ শতকের কালসীমায় রচিত গল্প (১৮৯১-১৯০০), খ. বিংশ শতকের সূচনাকাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী গল্প (১৯০১-১৯১৩), গ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্প (১৯১৪-১৯৪০)।

প্রথম অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-জীবন বিন্যাস এবং তাঁর মানস গঠনের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের জীবন ইতিহাসের প্রধান পর্বগুলো নির্দেশ করে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর ভাবনা এবং নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আলোকপাত করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে উনিশ শতকীয় সময় সমাজে নারী এবং পুরুষের বৈষম্যময় অবস্থান, নারী নির্যাতন, নিপীড়নের চিত্র। সেই সাথে নারী মুক্তির একটি অস্ফুট ধ্বনিও উচ্চারিত হয়েছে কখনো কখনো। তৃতীয় অধ্যায়ে নারী-পুরুষ সম্পর্কের পারস্পরিক টানাপোড়েন থেকে নারীর সচেতনতা এবং তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ লক্ষ করা যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ এবং তারই সূত্র ধরে নারী ক্রমশ: হয়ে উঠেছে স্বশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল, ব্যক্তিত্বময়। 'উপসংহার' অংশে উপস্থাপিত হয়েছে সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসত্য। উল্লেখ করা

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন যে, গল্পগুচ্ছের যে গল্পগুলো নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেবল সেই গল্পগুলোই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে গল্পসমূহের আঙ্গিকগত পরিচর্যাও বিবেচিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ডক্টর সিদ্দিকা মাহমুদার তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। এর সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিণ্যাসে তত্ত্বধায়ক ডক্টর সিদ্দিকা মাহমুদার আন্তরিক সহযোগিতা ও মূল্যবান নির্দেশনা আমার গবেষণাকে করেছে সহজতর, সচল। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন এবং ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, এম.ফিল প্রথম পর্বে এ দুজন কোর্স শিক্ষক আমাকে তাঁদের কোর্সে পড়বার সুযোগ প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। তাঁরা আমার নমস্য।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ দিয়ে যারা আমাকে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ভীষ্মদেব চৌধুরী, প্রফেসর রফিক উল্লাহ খান, প্রফেসর আকতার কামাল, পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের প্রফেসর মনোয়ার হোসেন জাহেদী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রতি জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কাজ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা সরবরাহ করে যারা আমার সময় এবং শ্রমের সাশ্রয় করেছেন, গবেষণা কাজকে সহজতর করেছেন,তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রস্তুতিকরণ শাখার সহকারী গ্রন্থাগারিক, আমার শ্রদ্ধেয় ফুপুমনি শিরিন মাফরুজা বানু, সাবেরা বেগম, জহুরা বেগম এবং সিনিয়র ক্যাটালগার শামীম আরা। তাঁদের প্রতি রইলো আমার অন্তহীন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। এছাড়া বন্ধু ও সতীর্থ ফারহানা হক সুরভী, উৎপলেন্দু কীর্তনীয়া, সেলিমভাই এর স্বত:স্ফূর্ত আলোচনা ও অভিমত আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। এদের সাহচর্য ও সহযোগিতা আমার জীবনের অমূল্য সঞ্চয়।

এ গবেষণা কাজে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, রোকেয়া হল লাইব্রেরী এবং যশোর পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এখানকার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মুদ্রণ কাজে নিরলস পরিশ্রম করে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা পাবলিক কলেজের কম্পিউটার অপারেটর গিয়াস উদ্দিন মিঠু। তাঁর নিরলস শ্রমের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। আর যার সার্বক্ষনিক সহযোগিতা এবং সাহচর্য এ গ্রন্থের প্রকাশকে সম্ভব করেছে, তিনি আমার অগ্রজ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

পাবলিক কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক, শুভ সাহা। তার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আমি তার মঙ্গল কামনা করি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকেই গেল। সে জন্য আমি সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করছি।

রীতা রানী সাহা

এম.ফিল গবেষক
বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২৯ সেপ্টেম্বর,২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক (১৮৯১-১৯০০) ৪৪

তৃতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক (১৯০১-১৯১৩) ৭৫

চতুর্থ অধ্যায় : তৃতীয় পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক (১৯১৪-১৯৪০) ৮৬

উপসংহার : ১১৮

গ্রন্থপঞ্জি : ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

উনিশ শতকের নতুন শিল্প-আঙ্গিক ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর জনয়িতা ও রূপকার। তাঁর হাতে তা ক্রমবিকশিত হয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে; যদিও এই শতাব্দীতেই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) প্রমুখের হাতে এই শাখার পরিণত ভিত্তিটি তৈরী হয়েছিল। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের স্পর্শ রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রম-উত্তরণকে সমুদ্রাভিমুখী করেছে। 'রামমোহন থেকে যে নবজন্মের সাধনার ধারা চলে আসছিলো, সেই চলমান প্রবাহ থেকেই বেরিয়ে এসেছেন তিনি-অথচ সেখানেই থেমে যাননি, সেই প্রবাহকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন প্রায় অকল্পনীয় দূরত্বে ও বিস্তারে। যুগকে একান্তভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রমণের অক্লান্ত ও অনিবার প্রচেষ্টাই কবির দীর্ঘ জীবনের বহুমুখী সৃষ্টিময়তার নিহিতার্থ। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ যেমন রেনেসাঁসের সৃষ্টি, তেমনি রেনেসাঁসের সুদূরপ্রসারী পরিণতি রবীন্দ্রনাথের সাধনকীর্তি।'১ সময়, সমাজ ও ব্যক্তি মনের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিনব রূপায়ণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে চিরন্তন মর্যাদা লাভ করেছে। পারিবারিক পরিবেশ, ঐতিহ্য, শিক্ষা দীক্ষা, বোধ, এবং যুগধর্ম রবীন্দ্র প্রতিভান শক্তির অনুকূলে সক্রিয় ছিল, এ কথা অনস্বীকার্য।

গল্পগুচ্ছে নর-নারী সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রজীবনগঠন ও মানসসঞ্চরণের দিকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। নর-নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবনা, যে মনোচিন্তাপ্রবাহের পরিচয় আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে পাই, তার মূল তাঁর জীবন বিন্যাসের মধ্যেই ছিল প্রোথিত।

শ্যামের এঁকে দেওয়া কড়ি কাঠের বৃত্তের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থেকে বালক রবীন্দ্রনাথের যে জীবন শুরু, তার মধ্যে রোপিত ছিল রবীন্দ্রনাথের মুক্তিকামিতার বীজ। বাড়ীর কঠোর প্রশাসন, মাতৃ-সান্নিধ্যের স্বল্পতা, পিতা ও অগ্রজদের সীমিত সংস্পর্শ এবং ভৃত্যকুলের আরোপিত পরিচালনারীতি তাঁকে ক্রমেই করে তুলেছিল নিঃসঙ্গ, তৃষ্ণার্ত। শিশুমনের এই দুঃসহ অবরুদ্ধতা থেকে বালক রবীন্দ্রনাথ কিছুটা মুক্তি পেয়েছিলেন বাড়ীর সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশের মধ্যে। বলা বাহুল্য, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছিল তখন (১৮৭৩) কোলকাতার বিদগ্ধ সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান; আর এ চর্চার পৃষ্ঠপোষক, প্রতিনিধি, উদ্যোক্তা ছিলেন প্রধানত ঠাকুরবাড়ীর কর্তারাই। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির হাওয়া দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে মিলেছিল আগেই। সেই সাথে পিতা দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ-আহরিত উদারতা ও প্রকৃতির মধ্যে জীবনের চলমানতাবোধ রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল সহজেই। অগ্রজদের স্বতন্ত্রধর্মী জ্ঞানানুশীলন, সাহিত্যানুরাগ গুণীজনের সমাবেশ, আনাগোনা ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক পরিবেশকে একটি সুমিত, সুষম আবহাওয়ার মধ্যে বইয়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখান

Dhaka University Institutional Repository

থেকে রবীন্দ্রনাথের মানস সত্তাটি হয়েছে পুষ্ট, বিকশিত। কিশোর মনের নৈঃসঙ্গ্য,গণ্ডীবদ্ধ জীবনের দুঃসহ পরিস্থিতি তাঁকে প্রকৃতি-মুখী, কল্পনাপ্রবণ করে তুলেছিল ক্রমশ। প্রকৃতির প্রবহমানতার মধ্যে শাশ্বত, অসীম প্রশান্তির উপলব্ধি অবরুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কোমল মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল তখন থেকেই যা পরবর্তীকালে দার্শনিকতামণ্ডিত মহীরূহে পরিণত হয়েছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক, গৎবাঁধা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ ছিলনা রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু তার বিপরীতে স্বাধীনভাবে, মুক্তমনে জ্ঞানানুশীলনের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর। সে কারণে বাড়ীর অগ্রজদের সংগৃহীত পুস্তক, পত্রিকা গৃহশিক্ষকের কাছে বিদ্যাভ্যাস, এবং বাড়ীর সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতি চর্চা থেকে তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার পথ নির্দেশনা পেয়েছিলেন। বৈষ্ণবপদাবলীর বিশুদ্ধ সাহিত্যরস তাঁকে প্রভাবিত করেছিল প্রবলভাবে। বলা যায়, এই বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টিকোণকে মিস্টিকতার গভীরে প্রসারিত করেছিল। পিতার ঔপনিষদিক উদারতার শিক্ষা রবীন্দ্র-চৈতন্যে প্রোথিত ছিল আজীবন। আর এসব কিছুর সাথে যাঁর সংস্পর্শ,উৎসাহ, অনুপ্রেরণা তাঁকে রবীন্দ্রনাথ করে তুলেছিল, তাঁকে পরিচালনা করেছিল, তাঁর নাম কাদম্বরী দেবী, দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। বালক রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ, অবরুদ্ধ, তৃষিত জীবনে এই বৌদি যেন অনেক দিনের পরে বৃষ্টির মতন। তাঁর আগমন, তাঁর সাহচর্য, তাঁর প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের মনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল। রোমান্টিসিজমের বোধের সূত্রপাতও এখান থেকেই।

পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা,দুঃখবোধ, বিরহ, অসীমের সাথে সসীমের মিলে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে মুক্তিকামিতা-এসব দর্শন তাঁর রোমান্টিক মানস --চৈতন্যের সুর হয়ে উঠেছিল।

১

কোন মহৎ প্রতিভাই দেশ-কালের প্রভাব মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথও এ সূত্রের বাইরে নন। সমকালীন রাজনৈতিক,আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে ইংরেজ শাসিত পরাধীন এই দেশে চলেছে নানা ষড়যন্ত্র। ১৮৯১ সালে এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে উগ্রবাদী হিন্দু যুব সম্প্রদায়কে দ্বিধাবিভক্ত করে তোলে ইংরেজ সরকার। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করলেন। শুরু হলো স্বদেশী আন্দোলন। রাজনীতিবিদ না হলেও দেশের এই চরম সঙ্কটে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন। রাখী বন্ধনের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলার সকল মানুষকে একাত্ম করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিল। তিনি পুর্নজাত হলেন বৈশ্বিক দায়িত্ববোধে। ১৯১৪ সালে ইউরোপে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৯ এর রাওলাট এ্যাক্ট এবং ১৯১৯ জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড তাঁকে ইংরেজ শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখান করলেন তিনি ঘৃণায়, প্রতিবাদে। লক্ষ্য করলেন মানবতাবোধ ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হিংসায় কেবল স্বদেশ নয়, সমস্ত পৃথিবী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের মুখে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় তাঁর সব আশঙ্কাকে সত্য করে দিয়ে। ১৯৪১ এ তাঁর জীবনাবসান হয়।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয়েও একজন দেশ-কাল-সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন বিশ্বব্যাপী সর্বত্রই চলছে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার,অন্যায়, শোষণ, শাসন। এ কর্তৃত্ব যেমন চলছে বিশ্বের ক্ষেত্রে, তিমনি দেশের ক্ষেত্রে, তেমনি সমাজ এবং পরিবারের ক্ষেত্রে। ইউরোপ, আমেরিকা-র, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, পাশ্চাত্য শিল্প, সাহিত্য,সভ্যতার সাথে পরিচিতি তাঁর চেতনাকে করেছে সমৃদ্ধ। এ কারণে দেশীয় সমাজের এই অসমতা,সংকীর্ণতা দেখে রবীন্দ্রনাথ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, বেদনার্ত হয়েছেন। মূলত: ইউরোপীয় রেনেসাঁসীয় মানবতাবাদ,ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, গণতান্ত্রিক প্রত্যয় রবীন্দ্র-মননে নারী-পুরুষ সমঅধিকারের উদারনৈতিক চেতনাকে দৃঢ় করে তোলে।

তাঁর ইউরোপ-ভ্রমণ (১৮৭৭,১৮৯০) দেশীয় সমাজব্যবস্থা ও নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন প্রভৃতি ভাবনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'এবং 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'-তে তার পরিচয় বিধৃত আছে। ইউরোপীয় সমাজ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর নারী-পুরুষ সম্পর্কিত ভাবনা :

'এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা, স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। ফাশানী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে সংসার চলতো না। ---------- এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নিরা সাদাসিধে। যদিও তাঁরা ভালো করে লেখাপড়া শেখেন নি, তবু তারা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এদেশে কথায় বার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করেন, আত্মীয়-সভায় একটা কোনো উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চা হলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বলতে পারেন।, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কতদিক দেখেন ও কী রকম চক্ষে দেখেন তা বুঝতে পারেন সুতারাং একটা কথা উঠলে কতকগুলো ছেলেমানুষি আকাশ থেকে পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও তাঁকে হাঁ করে থাকতে হয় না। ------- লোকসমাজে মুখটি খুব হাসিখুশি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসিতামাশা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একটা কিছু ভালো লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন।'২ রেনেসাঁস-উৎসারিত নারী-শিক্ষা, এবং নারী-স্বাধীনতার প্রতিফলন তিনি দেখতে চেয়েছেন এদেশের সমাজে। একারণে রবীন্দ্র-ভাবনায় স্বাতন্ত্র্য মন্ডিত নারী ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতি বার বার লক্ষ্য করা যাবে যে নারী পরিবারে তার নিজের অবস্থান,মর্যাদা অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং পরিবার, সমাজ এবং আত্মিক উন্নয়নে সক্রিয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীর সম অধিকার সচেতনতা সমমর্যাদাবোধের (শাস্তি, পয়লা নম্বর,অপরিচিতা, স্ত্রীর পত্র) ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মানসিক উদারতার দিক নির্দেশ করে। তবে পুরুষ-ব্যক্তিত্বের সাথে কোন সংঘর্ষ বা বিরোধে লিপ্ত হয়ে নয় বরং পারস্পরিক সমঝোতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা স্থাপনের মধ্যে দিয়েই

Dhaka University Institutional Repository

নারী -পুরুষের মধ্যে সুন্দর গৌরবময় জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্ভব-এই বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথের। 'আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসংগত এবং অমঙ্গলজনক বলে মনে হয়। ----- কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়; সেগুলিকে যদি অধীনতা হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি,তা হলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তা হলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারো অনুগামী হই তাহলেই আমি বাস্তবিক অধীন। আর আমি ধর্ম মনে করে যদি কারো অনুগামী হই তাহলে আমি স্বাধীন। সাধবী স্ত্রীর প্রতি যদি কোন স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্ত্বই বাড়ে'।৩

গল্পগুচ্ছে নর-নারী চরিত্র বিন্যাসের বৈচিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখকের মনোভাব সুস্পষ্ট যেখানে পুরুষ চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে, ব্যর্থতা অযোগ্যতা পুরুষকে অসহায় করে তুলেছে, সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ প্রত্যাশা এবং সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন সেখানে, (একরাত্রি, মেঘ ও রৌদ্র,নষ্টনীড়, হালদারগোষ্ঠী, রবিবার)। আবার যেখানে নারী চরিত্রের অবমাননা, নিপীড়ন, নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই তাঁর অন্তস্তলস্থিত বেদনা, সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। নারীর মধ্যে স্বাবলম্বী হবার দৃপ্ত চেতনা প্রত্যাশা করেছেন তিনি (মানভঞ্জন, অপরিচিতা,ল্যাবরেটরি)। তবে নর-নারী সম্পর্ক রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি তাঁর ভাবনায় ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা হলো নারীর আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি *গল্পগুচ্ছের* নারী চরিত্রের সরব ও নীরব বিদ্রোহে যার বহিঃপ্রকাশ (দেনা-পাওনা, কঙ্কাল,মহামায়া মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, হৈমন্তী, স্ত্রীরপত্র, পয়লানম্বর)। পুরুষের দাম্ভিকতার কাছে নতি স্বীকার না করে কোন কোন ক্ষেত্রে নারী জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে (দেনা-পাওনা,দিদি, হৈমন্তী)। জীবনের প্রান্তপর্বে এসে অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ নারী মুক্তির কথা ঘোষণা করলেন, যে মুক্তিচেতনা দেশ-কাল-সমাজ সচেতন মানবচেতনাপ্রবুদ্ধ হৃদয়ের অনিবার্য নিঃসরণ। যার সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর আবাল্য-লালিত রোমান্টিক ভাবনা-সসীমের অসীমের পথে যাত্রা, ক্ষুদ্রের বৃহতের সাথে মিলনাকাঙ্ক্ষা (শাস্তি, স্ত্রীরপত্র, বোষ্টমী)। 'রবীন্দ্রগল্পে নারীরই প্রাধান্য,মিলনে-বিরহে-অভিমানে-বিদ্রোহে কিংবা নীরব-নিঃসঙ্গ অন্তর্ধানে নারীর উজ্জ্বল জীবনাভাস গল্পগুচ্ছের বহুকৌণিক দীপ্তির অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি'।৪

২.

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। বিপুল সৃজন ভান্ডার তাঁর। সেখানে বৈচিত্র্যে কবিতারই প্রাধান্য। নর-নারীর আকর্ষণ--বিকর্ষণের সম্পর্কে কবিতা যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি উপন্যাস, নাটক,সঙ্গীত গীতিনাট্য এমনকি চিত্রকলাতেও নারী -পুরুষের ব্যক্তিত্ব,মহিমা, আনন্দ, বেদনা, বিষন্নতার চিত্র বিস্তর। রবীন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভার অনুপ্রেরণার মূলে যার অঙ্গুলি নির্দেশনা অব্যর্থ লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসরমান, তিনিও একজন নারী- তাঁর কাব্যলক্ষ্মী, তাঁর জীবন দেবতা। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনে কাদম্বরী দেবীর ভূমিকা স্মর্তব্য। ব্যক্তি জীবনে এই নারী রবীন্দ্র- -মনন এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যে কম বেশী তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। মূলত ব্যক্তি জীবনে রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই তাঁর রোমান্টিক চৈতন্যে নারী হয়েছে মহিমান্বিত। পুরুষের প্রেম, ভালোবাসা,সহযোগিতা কিংবা অসহযোগিতা ও বিরোধিতা নারীকে প্রকারান্তরে উজ্জ্বলতর করেছে। রবীন্দ্র-কাব্যে নারী প্রকৃতি-সত্তার সাথে সমার্থক। সে অর্থে পুরুষের দৃষ্টিতে নারী কখনো রহস্যময়ী, কখনো মানস সুন্দরী আবার কখনোবা সৃষ্টিশীলা। পুরুষের রোমান্টিক প্রেমাকাঙ্ক্ষার বিচিত্র রূপ আবর্তিত হয়েছে নারী কে কেন্দ্র করে। 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), 'মানসী'(১৮৯০), 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'কল্পনা' (১৯০০) সর্বত্রই নারী-পুরুষের চিরন্তন আকর্ষণ-বিকর্ষণের চিত্র । এ পর্যায়ে চিরন্তন প্রেমাকাঙ্খক্ষা একান্তই দেহজ। তবে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক এ পর্বেও সমর্পিত হয়েছে সেই রবীন্দ্র -দর্শন বিজড়িত প্রেমে, মানসীতেই যার প্রতিষ্ঠা :

'বৃথা এ ক্রন্দন
হায়রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয় ।
যাহা পাস তাই ভালো
হাসিটুকু কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস ।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
একী দুঃসাহস!

লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ
মধু-তার করো তুমি পান
ভালোবাসো প্রেমে হও বলী- ————
চেওনা তাহারে।
আকাঙ্খক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের ।
শান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধ কোলাহল ।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই । '
(নিষ্ফল কামনা)৫

Dhaka University Institutional Repository

এইভাবে রবীন্দ্র-কাব্যে মানস-প্রতিমা কেবল পুরুষের কামনার ধন নয়, ভোগ, বাসনা লিপ্সাকে ছাড়িয়ে সে প্রেম অনন্ত বিস্তারী। নর-নারীর আবেগ, সংরাগ, প্রীতি সেখানে দেহজ প্রেমকে ছেড়ে অসীম প্রেমের মধ্যে-মুক্তি খুঁজেছে। মানসী -পরবর্তী কাব্যেও বস্তুগত প্রেমাকাঙ্খক্ষা ক্রমশ বস্তুনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা' প্রভৃতি কাব্যে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে রবীন্দ্র-কাব্য যেহেতু ভাবপ্রধান, নর-নারী সম্পর্কটি এখানে তাই ক্রমশ শাশ্বত, প্রেম-সাধনায় লীন হয়েছে। আর নারীর সৌন্দর্য ক্রমশ নিসর্গের সৌন্দর্যের মধ্যে একাত্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), পর্যায়ে এসে এ সৌন্দর্য নির্বস্তুক, পরমারাধ্য, অন্তরতম হয়ে উঠেছে :

'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একাকী -
তুমি অন্তর বাসিনী'।

নারী -পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কিত জীবন রবীন্দ্র-কাব্যে রূপান্তরমুখী, বলা যায় রবীন্দ্র-দর্শন অভিমুখী। তারপর ও নর-নারীর চিরন্তন আকাঙ্খাক্ষা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যে ধবনিত হয়েছে বার বার :

'যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া !'
-(শা-জাহান, বলাকা, ১৩২১) ৬

বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর প্রতিবেশে গল্পের মতো কাব্য জগতেও রবীন্দ্র-দৃষ্টি বাঁক পরিবর্তন করেছে। নর-নারীর শাশ্বত স্তবকে ছাপিয়ে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে দেশীয় সমাজ, পরিবার প্রতিবেশর ওপর যেখানে নর-নারী সম্পর্ক তাঁর গল্পের মতোই প্রাত্যহিক প্রেম, আনন্দ-বেদনা, অভিমান, অন্তর্দহন, মুক্তিকামিতার মধ্যে দিয়ে সঞ্চরণশীল। এ পরিবর্তন কেবল বিষয়গত নয়, ছন্দ, ভাব, ভাষা, গতি এবং শৈলীর মধ্যেও এসেছে নতুন মাত্রা।

'সুখের দুখের কথা
একটু খানি ভাবব সময় ছিল কোথা ?
এই জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ কিংবা যা-হোক-একটা কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে !
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা

Dhaka University Institutional Repository

কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি ,
রাধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা ,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা ।৭
(মুক্তি, পলাতকা, ১৩২৫)

গৃহকর্মে বন্দী নারীর অবমাননা, বেদনা অসহায়ত্বের এই করুণ চিত্র যেমন ভয়াবহ, তেমনি বিস্ময়কর। কেবল নারী নয়, একজন মানুষের অন্তর্গত বিপুল সম্ভাবনাকে অপব্যবহার করে তার জীবনকে শূণ্যতার গহবরে ঠেলে দিয়েছে যে শক্তি তার নাম 'পুরুষ'। নারীর প্রতি পুরুষের এই অমানবিক আচরণ, অসম ভাবনার সাথে সম্পর্কিত হয়েই আবর্তিত হয়েছে আমাদের দেশের নর-নারী সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে *গল্পগুচ্ছে* (১৮৯১) সম্প্রসারিত হয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনায় *গল্পগুচ্ছে* নর-নারী সম্পর্ক কোন বিচ্ছিন্ন কিংবা অভিনব বিষয় নয়, সমগ্র রবীন্দ্র--সাহিত্যেই এর সূচনা,বিস্তার পরিণতির চিত্র ছড়িয়ে আছে বিপুল পরিমাণে।

নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং সুবিস্তৃতভাবে পাওয়া যাবে। তবে সামাজিক এবং কালিক পটভূমি এক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-মননকে প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহে। জীবনবোধের প্রাগসরতায় রবীন্দ্রনাথের নারীরা এখানে জীবনমুখী, ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে আপোষহীন সেই সূত্রে পুরুষ অনিবার্যভাবে এখানে বিচিত্রভাবে সম্পর্কিত। নারীর প্রেমে বেদনায়, অতৃপ্তিতে,ঘৃণায়, আত্মচেতনার জাগরণে,মুক্তিতে সর্বত্রই রয়েছে পুরুষের সদর্থক-নঞর্থক ভূমিকা। নর-নারী সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'চোখের বালি' (১৯০৩) থেকে যদি শুরু করা যায় তাহলে বিনোদিনীর নাম স্মরণ করতে হয় সর্বাগ্রে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা ব্যক্তিত্বময়ী বিনোদনী অকাল বৈধব্যের কারণে ছিল অতৃপ্ত। আশা-মহেন্দ্রর সুখময় দাম্পত্য জীবন দেখে সে হয়ে ওঠে ঈর্ষান্বিত। কেননা মহেন্দ্রর সাথে বিয়ে হবার কথা ছিলো বিনোদিনীর। মহেন্দ্রর চিত্ত-দৌর্বল্য এবং ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। মহেন্দ্রর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে মহেন্দ্রকে পথ ভ্রষ্ট করেছে সহজেই, কিন্তু তা জৈবিক অতৃপ্তি পূরণের জন্য নয়। আবার মহেন্দ্রর পাশে দৃঢ়চিত্ত, ব্যক্তিত্ববান বিহারীকে সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, নিজেকে সমর্পণও করতে চেয়েছে, তার পশ্চাতেও দেহগত কারণ গৌণ বলেই মনে হয়। কেননা, এলাহাবাদের নির্জন ঘরে বিনোদিনীর মুখে সবশুনে সে যখন বিনোদিনীর প্রতি করুণায়, বিশ্বাসে, প্রেমে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, তখনই বিনোদিনী তাকে প্রত্যাখান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'---- ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে। তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি একাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিবনা।----- ভুল করিয়োনা,-আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার, গৌরব যাইবে, আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব'।৮

বিনোদিনীর এ গৌরব ব্যক্তিত্বের গৌরব। মহেন্দ্র এবং বিহারী এই দুই পুরুষের কাছে থেকে বিনোদিনী যা চেয়েছে, তা হলো তার প্রেমের স্বীকৃতি, ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। যখনই সে তা পেয়েছে, তখনই দুই পুরুষকেই দূরে ঠেলে দিয়েছে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ব্যক্তিত্বময়ী এই নারী। 'গোরার' (১৯১০) বিষয় পটভূমি ভিন্ন হলেও গোরার স্বদেশ,সমাজ,ধর্ম সম্পর্কিত তর্ক, উপেক্ষা, সুচরিতার মধ্যে বিশ্বাস,অনুরাগ স্থাপন করছে। সুচরিতা এখানে শান্ত, নম্রতায় আনত একনারী। তার প্রেমই গোরাকে স্বদেশভাবনার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছে শেষ পর্যন্ত। আর গোরার প্রেমভাবনা বেড়ে উঠেছে ললিতাকে আশ্রয় করে এবং তা স্থিতি লাভ করেছে সুচরিতার মধ্যে। পাশাপাশি ললিতা চঞ্চলা, বুদ্ধিমতী। বিনয়ের সুপ্ত ব্যক্তিত্বকে সেই-ই জাগিয়েছে। হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজের বিনয়ের সাথে ব্রাহ্ম-কন্যা ললিতার মিলন সংঘটিত হয়েছে ললিতার প্রাগ্রসর চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে। 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসে দামিনী বিনোদিনীর মতোই 'জীবনরসের রসিক'। 'বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায়না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকিপয়সা খাজনা দিবেনা পণ করিয়া বসিয়া আছে'।৯ প্রেমে ভালোবাসায়, বিশ্বাসে, ভক্তিতে তার আত্মনিবেদন শচীশের কাছে। শচীশের প্রত্যাখ্যাত পদাঘাতকে সে তার 'গোপন ঐশ্বর্য', 'পরশমণি' বলে ভেবেছে। আবার দামিনীর প্রেম শচীশকেও প্রকম্পিত করেছে আমূল। 'জপে, তপে, অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখে দেখিলে বোঝা যায়, ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে'।১০ দামিনীকে সে তাদের দলে আহবান করেছে যখন, তখন থেকেই তার অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু। এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে সে, দামিনীকে জানিয়েছে সবিনয় অনুরোধ: 'তুমি আমাকে দয়া কর,তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও'।১১ অন্তর্দ্বন্দ্বের অনিবার্য চাপে শচীশ-দামিনী উভয়েই হয়েছে ক্ষরিত,ক্ষয়িত। শচীশের অনুরোধে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করেছে সে , কিন্তু তার প্রেম ছিল শচীশেই সমর্পিত। এতো গেলো নর-নারীর অতৃপ্ত প্রেম, কামনা-বাসনার দংশনে যা রক্তাক্ত,করুণ, বেদনাময় কিন্তু এর চেয়েও বাস্তবধর্মী করুণ চিত্র পাওয়া যাবে এ উপন্যাসেরই আরেক প্রান্তে।গুরুর কাছে সম্পত্তিসহ দামিনীকে দান,দামিনীর অলংকার চুরি প্রভৃতি ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পুরুষ যে নারীর প্রতি কতটা অমানবিক, নির্মম, পৈশাচিক ব্যবহার করতে পারে দামিনীর প্রতি স্বামীর কার্যকলাপ, ননীবালার ঘটনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় পুরুষের আগমন দুজনের নৈকট্য সংকটাপন্ন করেছে। নিখিলেশ তার ভাবাদর্শ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ স্ত্রী বিমলার ওপর আরোপ করতে গিয়ে ছিটকে পড়েছে সেখান থেকে। সন্দীপ এসে জায়গা জুড়েছে। স্বদেশ ভক্তির আবরণের নীচে বিমলার প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

তার আকর্ষণ, অর্থলোলুপতা ক্রমশ সন্দ্বীপকে প্রতারক হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। ফলে তাকেও চলে যেতে হয়েছে দূরে। আর নিখিলেশ-সন্দ্বীপের সাহচর্য বঞ্চিত বিমলা হয়েছে দীর্ণ, বিবর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত। শেষে অমূল্যকে আশ্রয় করে বিমলা হয়ে উঠেছে স্নেহময়ী, অবিচল। নির্লিপ্ত ভাবাদর্শের ফাঁকি নিখিলেশ-বিমলা-সন্দ্বীপ এ তিন ব্যক্তিকে শূণ্যতার মধ্যে নিয়ে গেছে। সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়েও তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে মেরুদূর ব্যবধানে। নিখিলেশের স্বীকারোক্তিতে তার প্রমাণ মিলবে:

'আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিলো । বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করবো আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটাতো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হয়ে গেছি তা জানতেই পারিনি। বিমল নিজে যা হতে পারতো তা আমার চাপে ফুটে উঠতে পারেনি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধজীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলছে'। ১২

'শেষের কবিতা' (১৯২৯) তেও অমিত-লাবণ্য'র প্রেম দুজনকে আশ্রয় করে স্ফুরিত কিন্তু দুজনের বন্ধুত্বকে তারা দাম্পত্যের বন্ধনে না বেঁধে উন্মুক্ত অসীম করতে চেয়েছে। দুজনেই তাদের পারস্পরিক প্রেমকে তুচ্ছ করে দেখতে পারেনি। বরং তাদের জীবনের প্রয়োজনে জীবনসঙ্গী হিসেবে অন্যকে গ্রহণ করেও প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েছে অকুণ্ঠিত চিত্তে। তাই যোগমায়া যখন লাবণ্যকে বলে, 'আজ আমার বোধ হচ্ছে কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হতো'। তখন লাবণ্য তা মেনে নিতে পারেনি। যোগমায়ার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করছে সে-'না না তা বলোনা। যা হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু যে হতে পারতো এ আমি মনেও করতে পারিনে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি নিতান্তই শুকনো---কেবলই বই পড়বো,আর পাস করবো, এমনি করে আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলেম আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হোল এই আমার ঢের হয়েছে, মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কি চাই'। ১৩

অমিতও কেটিকে গ্রহণ করেছে লাবণ্যকে স্বীকার করে নিয়ে: 'একদিন আমি সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইলো'। ১৪ কেবল তাই নয়, শোভনলালকে গ্রহণ করে লাবণ্য যেমন অমিতকে তার স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করেনি, অমিতেরও কেতকীকে বিয়ে করতে হয়েছে সত্য, তার আবেগ, সংরাগের স্বীকৃতি তাকে দিতে হয়েছে বটে, কিন্তু লাবণ্যকে তার পূর্ণ গৌরব ও সম্মান সে দিয়েছে নির্দ্বিধায়।

Dhaka University Institutional Repository

'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসে নর-নারী সম্পর্কের চিত্র যেমন করুণ,মর্মান্তিক, তেমনি বাস্তব। বিপ্রদাস-কুমুদিনী-মধুসূদন-মুলত এ তিন চরিত্রকে ঘিরে নারী -পুরুষের পারস্পরিক চিত্র উজ্জ্বল হয়েছে ক্রমান্বয়ে। কুমুদিনীর জীবনে দাদা বিপ্রদাসের আর্দশ, শিক্ষা, মমত্ববোধ সহানুভূতি পরম সত্য। সেই ছাঁচেই তার মানসগঠন সম্পন্ন হয়েছে। আর বিপ্রদাসের কাছে কুমুদিনী পরম আদরনীয় যার জন্য আত্মসম্মানবোধের লাঞ্ছনাকে মেনে নিয়েছে সে অবলীলায়। শেষ পর্যন্ত তার আদর্শের পরাভবে আত্মবির্সজন দিয়েছে সে। আর মধুসূদন হচ্ছে সেই পুরুষ যার স্থুলতা,ব্যক্তিত্বহীনতা, অন্ত:সারশূণ্যতা যত প্রকট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, স্ত্রী কুমুদিনীর স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ততই যেন উজ্জ্বল হয়েছে। তার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, কল্পনা, আদর্শকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে স্বামী মধুসূদনের ঔদ্ধত্বপূর্ণ মানসিকতা, হীন কার্যকলাপ। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বজাত রক্তক্ষরণ কুমুদিনীকে করেছে অসহায়, বেদনার্ত। মধুসূদন-কুমুদিনীর প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য,রুচিগত পার্থক্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধ দাম্পত্য জীবনে দুজনকে দুই মেরুতে নিয়ে গেছে। মধুসূদন কর্তৃত্বের জোরে কুমুদিনীকে কাছে পেয়েছে সত্য, সে নৈকট্য যে কতখানি অন্ত:সারশূণ্য, কতটা সবল চপেটাঘাতের মতো তা মধুসূদন বুঝতে পেরেছে কুমুর স্বাধীন ইচ্ছার পরিচয় পেয়ে। তাতেও অবশ্য মধুসূদনের উন্নতি ঘটেনি; বরং দাসী শ্যামার স্থুল লালসার মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে স্খলনের পূর্ণতা সাধন করেছে। কুমুদিনী স্বভাবগত সহিষ্ণুতায় অন্তর্দ্বন্দ্বজাত আপোস করতে চাইলেও স্বামীর প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি তাকে ক্রমেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত করেছে। শেষপর্যন্ত ভাবী সন্তানের আশ্রয়ের কাছে পরাজয় ঘটেছে তার। লাঞ্ছনার নিষ্পেষণে দলিতা কুমুদিনী প্রত্যাবর্তন করেছে বাস্তবতার কাছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৌরভ সেখানে ক্ষয়িষ্ণু, নিষ্প্রভ, নিষ্প্রাণ।

'দুইবোন'' (১৯৩৩) 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) উপন্যাসে নারী -পুরুষের সম্পর্ক রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ সমধর্মী উপকরণ ব্যবহার করেছেন। দু'টি গল্পেই নর-নারীর ত্রিভুজ প্রেম জীবনকে শুষ্ক, বিপর্যস্ত করে তুলেছে। দু'টি গল্পেই স্ত্রীর শারীরিক, অসুস্থতা, পঙ্গুতা স্বামীকে উদাসীন, সংসারবিমুখ করেছে। স্ত্রীর অসহায়ত্বের সুযোগে স্বামী অন্য নারীর প্রতি হয়েছে আসক্ত। সেক্ষেত্রে, বলা যায়, এক নারী -আরেক নারীর দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়েছে, পুরুষকেও করেছে বিপথগামী। এ সূত্র দুইবোন -এর শর্মিলা - শশাঙ্ক-উর্মিলার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি 'মালঞ্চ'র নীরজা-আদিত্য-সরলার জীবনেও সত্য। নর-নারীর এ সম্পর্কের চিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঘুরে ঘুরেই এসেছে কী উপন্যাস, কী ছোটগল্পে। এ প্রসঙ্গটি ভাবতে গেলে রবীন্দ্র-জীবনের সেই রহস্যময় পর্বটির কথাই বার বার আসে যেখানে বৌদি কাদম্বরী-দেবীর আগমন, বিচরণ এবং স্বেচ্ছামৃত্যু (১৮৮৪) রবীন্দ্র-মানসে এক বিশেষ সংঘটনমাত্র নয়, বরং রবীন্দ্র প্রতিভা স্ফূরণের এক বিশেষ প্রান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-ভালোবাসা এবং মিলনে-বিরহে, পাওয়া না পাওয়ার এই যে যন্ত্রণা, তাই বিষয় হয়ে উঠেছে 'মায়ার খেলা'(১৮৮৮) নাটকে।মায়াকুমারীদের গানের মধ্য দিয়েই নর-নারীর চিরন্তন পারস্পরিক আর্কষণ-বিকর্ষণের চিত্র পাওয়া যাবে :

'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলেনা
শুধু সুখ চলে যায়।
এমনি মায়ার ছলনা।
এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়।
তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ।
তাই মান অভিমান
তাই এত হায় হায়'। ১৫

'মানসী' (১৮৯০) কাব্যে নর-নারীর এ পারস্পরিক মোহ স্থিতি লাভ করেছে। 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) নাটকেও রাণী সুমিত্রার প্রতি রাজা বিক্রমদেব এর দুর্বলতার মোহ তাকে ব্যক্তিত্বহীন,কর্তব্যহীন নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। সে মোহ ভঙ্গ করেছে রাণী স্বয়ং রাজাকে ছেড়ে গিয়ে। কেননা পুরুষের এ কর্তব্যহীনতা, দুর্বল মোহ নারীর কাম্য নয়। মোহাচ্ছন্নতার আবরণ ভেদ করে রাজাকে কর্তব্যের জ্যোতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই রাণীর লক্ষ্য। এ লক্ষ্য রাজার প্রতি তার আনুগত্য, প্রেমেরই বহি:প্রকাশ। 'তোমরে যে ছেড়ে যাই, সে তোমারি প্রেমে'।

'চিরকুমার সভা' (১৯২৬)-তেও চিরকৌমার্যের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিক্ষেপিত হয়েছে নারীর অনিবার্য ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে। 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে জয়সিংহ মৃত্যুর পূর্বে যে সত্যের সন্ধান পায় , তা অপর্ণাই তাকে দিয়েছে । এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটক, নাটিকা,গীতিনাট্য কাব্যনাট্যে দেখা যাবে পুরুষ কিংবা নারীর পরস্পরের সংযোজন-বিয়োজনের মধ্যে দিয়েই জীবনের পরম সত্যটি প্রকাশ লাভ করেছে।

সঙ্গীতের মধ্যেও সে একই কথার অনুবর্তন। প্রেমপর্ব, বিচিত্রপর্ব কিংবা প্রকৃতি পর্যায়ের বিভিন্ন গানে নর-নারীর বিরহ -বেদনা প্রেম-মহিমা, আকাঙ্ক্ষা-অনুরাগ বিচিত্র অনুষঙ্গ বিচিত্রভাবে ধরা পড়েছে। আর পূজা পর্যায়ের গান -সে তো প্রিয়তম কিংবা প্রেয়সী কিংবা বন্ধুর প্রচ্ছদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির তাৎপর্যে একটি পরম্পরায় সম্পর্কিত। এখানে স্রষ্টা পুরুষ কিংবা নারী সেটি বড় কথা নয়, সে বন্ধু। আর এ মধুময় বন্ধুত্বকে আশ্রয় করেই চলে মানবাত্মার লীলা, প্রেম-বিরহ,মান -অভিমান। নারী কিংবা পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক সম্পর্কের রূপটি এখানে বিশ্বস্রষ্টা ও সৃষ্টির তাৎপর্যে আরোপিত, যা বৈষ্ণবীয় পরমাত্মা-জীবাত্মার অভিব্যঞ্জনায় সমর্পিত।

'শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।

হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো
দাওগো আমার হাতে
ধরব তারে, ভরব তারে
রাখব তারে সাথে'। ১৬

রবীন্দ্র-চৈতন্যে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক গানের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন। উপন্যাস, নাটক, গল্পের মতো নয়, কবিতার মতো। এখানে নর-নারীর সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ দর্শনে সমর্পিত। সে দর্শন কখনো অধ্যাত্ম-স্পর্শী জীবাত্মা-পরমাত্মায় সমর্পিত, কখনো বা রাবীন্দ্রিক-চৈতন্যময়।

চিত্রকলা-তেও দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নারী বিমর্ষ,বিষন্ন -বদন। পুরুষও বিশেষ ঢঙে তার চরিত্র নিয়ে প্রকাশমান। উপন্যাস গল্পের মতো রবীন্দ্র চিত্রকলাতে নারী -বাক্তিত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। যদিও তাঁর চিত্রকলা সৃজনের পশ্চাতে আর্জেটাইন মহীয়সী নারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর (১৯২৪) উৎসাহ, অনুপ্রেরণা গভীরভাবে কাজ করেছে, তথাপি তাঁর অঙ্কিত অধিকাংশ নারী বঙ্গদেশীয়। তবে ষাটোর্ধ জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এরা সৃজিত বলে স্বভাবতই এরা অধিকাংশ নগরবাসিনী, আধুনিক। সে কারণে বেশির ভাগ নারী-অবয়বে কালের ছাপ স্পষ্ট। অধিকাংশই আত্মমগ্ন, রহস্যময়ী। নারী-পুরুষের যুগল চিত্রে নারী অধোমুখী, পুরুষও যেন স্তব্ধতার অনুভবে অভিব্যক্ত। আবার কোন কোন চিত্রে আত্মনিমগ্ন নারী মুদ্রিত নয়নে পরম নির্ভরতায় পুরুষে সমর্পিত। পুরুষ ও সেখানে রাবীন্দ্রিক ঢঙে হাস্যোজ্জ্বল, ব্যক্তিত্বময়। জীবনের প্রান্ত পর্বে এসে দুঃখ বেদনাকেই রবীন্দ্রনাথ পরম সত্য বলে মেনেছিলেন। 'সত্য যে কঠিন/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম। সে কখনো করে না বঞ্চনা'-'শেষ লেখা' (রূপনারানের কূলে)র এ কবিতায় যে উপলব্ধি, যে স্থিরতা,বিচক্ষণতা কবি-মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,তাই-ই তাঁর এই সময়কার সৃজিত চিত্রকলায় বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। এমনকি তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি (১৯৩৫) ও এ সূত্রের বাইরে নয়। আলো-অন্ধকারের আবরণে প্রকাশমান চিত্রগুলো তাই বিচিত্র অভিব্যক্তিময়তায় পূর্ণ, সমৃদ্ধ। বলা বাহুল্য হবে না যে, এই অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের একান্তই নিজের সৃষ্টি, অভিনব আবিষ্কার।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ যখন ছোট গল্প লেখা শুরু করেন, তখন বাংলা সাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প কিংবা গল্পকারের দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে ছিলনা যেখান থেকে তিনি অনুপ্রেরণা কিংবা পথ নির্দেশনা পেতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু ছোট ছোট কাহিনীধর্মী উপন্যাস ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে সফল ছোট গল্পের অস্তিত্ব তখন ছিল দুর্লভ। এক্ষেত্রে বলা যায়, পাশ্চাত্য গল্পলেখক এবং ছোটগল্পই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র অনুপ্রেরণার উৎস।'' ---------- রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে, আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অন্যের স্মৃতিকথায় ও আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গ্রন্থাগারেও তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষ প্রমাণই রয়েছে যে, অ্যামেরিকান গল্প-লেখক আরভিং, অ্যালান পো, নাথালিয়েল হর্থন, মার্ক টোয়েন, হ্যামলিন, গারল্যান্ড, ফরাসী লেখক মোপাসাঁ, বারজাক, গোতিয়ের,দোদে, ফ্রাঁস ইংরেজ লেখক স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে , রাশিয়ান লেখন গোগাল, চেকভ, তুর্গেনিভ, তলস্তয় , গোর্কি দস্তয়েভ্সকি প্রমুখের লেখা ছোটগল্পের বিচিত্র রূপরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অনেক গল্পের বই-ই তিনি মন দিয়ে, এমনকি দাগ দিয়েও পড়েছিলেন। প্রিয়নাথসেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত কিংবা প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে এই জাতীয় গল্পের বই আদান প্রদানও করেছেন''। ১৭ সমালোচকের এ মন্তব্য থেকে ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা-উৎস সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগাল্পিক প্রতিভা অভিনব এবং আজ পর্যন্ত অনন্য। বলা যায় তাঁর হাতেই ঘটেছে ছোটগল্পের সফল মুক্তি।

৩

কবিতা, উপন্যাস, নাটক সঙ্গীত,চিত্রকলা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিপুল ভাণ্ডার থেকে নর-নারী সম্পর্কের রূপ অন্বেষণ করে যা দেখা গেল, তাহলো কবিতায় নর-নারী সম্পর্ক ভাবগত, নাটকে তা প্রথাআশ্রয়ী সেই সূত্রে গতানুগতিক, উপন্যাসে মনোবিশ্লেষনধর্মী, ব্যক্তিগত এবং সঙ্গীতে-চিত্রকলায় তা বিশেষ রবীন্দ্র-দর্শন সংলগ্ন। (কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তা নিতান্তই প্রাত্যহিক, জীবন থেকে আহরিত, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে একাত্ম। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে জমিদারি দেখাশুনা করতে এসে (১৮৯০) পদ্মার বুকে ভেসে বেড়িয়েছেন বোটে চড়ে, দুই পারের গ্রামীণ মানুষের জীবন যাত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন। নর-নারীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্বার্থপরতা হীনতা প্রভৃতি উপলব্ধি করেছেন তাঁর সহজাত সংবেদনশীলতায়। সংবেদনশীল হৃদয়ের সাথে প্রকৃতির নিবিড় ঐকাত্ম্য -এ দুইয়ের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এরই ছবি আমরা পাই 'সোনারতরী' (১৮৯১) 'চিত্রা' (১৮৯৩) 'চৈতালী' (১৮৯৬) '(কল্পনা)' 'ছিন্নপত্র' (১৯১২) 'গল্পগুচ্ছে' (১৮৯১)।)

'ছিন্নপত্র' '*গল্পগুচ্ছ*' রচনার উৎস ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের এক আকর গ্রন্থ, বলা যায়। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের পদ্মা-তীরবর্তী গ্রামীণ অভিজ্ঞতাই যে *গল্পগুচ্ছ* রচনার মূল উৎস, বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিতে তার প্রমাণ মেলে। ছোটগাল্পিক প্রতিভার উৎস এবং বিকাশের পটভূমি এবং তার মূল্যায়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমতের পরিচয় নিম্নোক্ত উদ্বৃত্তি সমূহে বিধৃত:

Dhaka University Institutional Repository

ক. আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই -যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণা করা গেছে।

------রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র

খ. (শিলাইদহে পদ্মার) বোটে ছিলাম আমি একলা, সঙ্গে ছিল এক বুড়ো মাঝি, আমার মতো চুপচাপ প্রকৃতির, আর ছিল এক চাকর ফটিক তার নাম, সেও স্ফটিকের মতোই নিঃশব্দ। নির্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মতো সহজে। বোট বাঁধা থাকত পদ্মার চরে। সে দিকে ধূধূ করত দিগন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি, জনহীন, তৃণশস্যহীন । মাঝে-মাঝে জল বেঁধে আছে, সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখির দল। নদীর ওপারে গাছপালার ঘন ছায়ায় গ্রামের জীবনযাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে, চাষীরা গোরু মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের ক্ষেতে,মহাজনী নৌকা গুণের টানে পার হয়ে গতিতে চলতে থাকে, ডিঙি নৌকা পাটকিলে রঙের পাল উড়িয়ে হু হু করে জল চিরে যায়, জেলে নৌকা জল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা-এর মধ্যে প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানাপ্রকার নালিশ নিয়ে, আলোচনা নিয়ে।পোস্টমাস্টার গল্প শুনিয়ে যেত গ্রামের সদ্য ঘটনা এবং তার নিজের সংকট সমস্যা নিয়ে, বোষ্টমী এসে আশ্চর্য লাগিয়ে যেত তার রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করে। বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়ালে,ছড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে,নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে। দুইধারে কত টিনের -ছাদ-ওয়ালা গঞ্জ, কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনারায় হাট , কত ভাঙ্গন ধরা তট, কত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল ছেলের জটলা, বনঝাউ-আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উঁচু পাড়ির কোটরে কোটরে গাঙশালিকের উপনিবেশ। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে -ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়।

-রবীন্দ্রনাথের উক্তি।

প্রভাত-রবি। রবিচ্ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

গ. অল্প বয়সে বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দের ধারা উদ্‌বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দ বিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই।

রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্র-৯

ঘ. Mr. sudarshan: Can you kindly tell us something of the background of your short stories and how they originated?

The Poet: It was when I was quite young that I began to write short stories. Being a landlord I had to go to villages and thus I came in touch with the village people and their simple modes of life. I enjoyed the surrounding scenery and the beauty of rural Bengal. The river system of Bengal the best part of this province, fascinated me and I used to be quite familiar with those rivers. I got glimpses in to the life of the people, which appealed to me very much indeed. At first I was quite unfamiliar with the village life as I was born and brought up in Calcutta and so there was an element of mystery for me. My whole heart went out to the simple village people as I came in close contact with them. They seemed to belong to quite another world so very different form that of Calcutta. My earliar stories have this background and they describe this contact of mine with the village people. They have the freshness of youth. Before I had written these short stories there was not anything of that type in Bengali literature.

Forward, 23 Fenruary, 1936* ১৮

পদ্মা-তীরবর্তী প্রকৃতি মানব মনে তথা মানব জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর সংবেদনশীল অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। *গল্পগুচ্ছের* প্রথম (১৮৯১-১৯০০) পর্বের গল্পগুলোতে তার দৃষ্টান্ত মিলবে বিপুল পরিমাণে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেধা, মনন আর বিচক্ষণতা দিয়ে এদেশের নারী পুরুষের মনের প্রকৃতি, গতি, স্বভাবটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন অত্যন্ত নির্ভুলভাবে। সে কারণে *গল্পগুচ্ছে* গ্রামীণ পরিসরে কিংবা শাহরিক পরিবৃত্তে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক দৈনন্দিন জীবন-প্রণালীর চিত্রটি এত সত্যময়, এত বাস্তব হয়ে উঠতে পেরেছে। কেবল তাই নয়, সূক্ষ্মদর্শী প্রজ্ঞা এবং আশ্চর্য দূরদৃষ্টিময় দক্ষতায় তিনি ভবিষ্যতের নারী -পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্রটিও কী নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে (১৯১৪) বসেই । সে কারণেই চারুলতা

Dhaka University Institutional Repository

(১৯০১), মৃণাল (১৯১৪), কল্যাণী (১৯১৪), অনিলা (১৯১৭),অচিরা (১৯৩৯) চরিত্রগুলো আজও কত আধুনিক। এমনকি নন্দকিশোর-সোহিনীকেও (১৯৪০) কর্মে,চিন্তায়, ব্যক্তিত্বময়তায় এখনও সময়ের চেয়ে কত অগ্রগামী বলে মনে হয়। নারী পুরুষের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ মানসতার পরিচয়ে হতে হয় বিস্মিত, অভিভূত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এমন বিশ্লেষণ, এমন জীবন ঘনিষ্ঠতা, ব্যক্তিত্বময়তা, সচেতনতা বাংলা সাহিত্যে ছিল অনুপস্থিত। এ ভাবনাটিকে রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা না করে বরং তাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তবে বিষয়টি রবীন্দ্র-মননে সচেতনভাবে আরোপিত নয়। পদ্মাতীরবর্তী পরিবেশে প্রকৃতির নির্জনতায় সাধারণ মানুষের সারল্য-কৌটিল্যে তাঁর সংবেদনশীল কবি মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ পরম সৃষ্টিশীলতায় যেন বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর কবিমনের গীতধর্মিতাই তাঁকে পথ দেখিয়েছে, নতুন সৃষ্টির আনন্দে উদ্বুদ্ধ করেছে। সমালোচকের ভাষায়, 'মানুষের মন ও হৃদয়ের যত কিছু বিচিত্রভাব ও অনুভূতি আমাদের অন্তরের মধ্যে নানা রূপে ও রসে বিচিত্র, বর্ণে ও গন্ধে নন্দিত হইত; কিন্তু তাহা প্রকাশের কোন পথ ছিলনা; তাই তাহার স্বরূপ কাহারও জানা ছিলনা, জীবনের এই দুর্লভগোচর দিকটাকে জানিবার আগ্রহও ছিলনা। জীবনের এইসব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা ও খন্ডাংশ এবং তাহার তুচ্ছতর সুখ দুঃখ লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ ক্ষুদ্র বলিয়াই, পরিসর ইহাদের কম বলিয়াই ইহাদের মধ্যে ছোটগল্পের উপাদানও বেশি করিয়াই ছিল।' ১৯

এভাবেই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের বর্ণময় অভিযাত্রা। নারী -পুরুষের মিলন,বিরহ,নিঃসঙ্গতা,স্বকীয়তা চিত্রায়নে যে মৌল গুণটি রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছকে* অনন্য করেছে তা হলো রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা।এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে :

> 'রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বেছে নিতে হলে আমাদের খুঁজতে হবে কোথায় তাঁর দুই সত্তায় সামঞ্জস্য ঘটেছে, একটা অন্যটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি, কোথায় কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে কোনোটাকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া যায় না। সে-রকম বই 'গোরা' 'চতুরঙ্গ' 'যোগাযোগ', কিন্তু এই সংগতিসাধনের দৃষ্টান্তরূপে সর্বাগ্রে যার নাম করতে হয় , সে-বই 'গল্পগুচ্ছ'।২০

এ কবিত্ব '*গল্পগুচ্ছে*'র মূল আকর্ষনী শক্তি। গল্পের বুননের সঙ্গে কবিমনের সংবেদনশীলতা নারী-পুরুষের মানোভূমি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই সঙ্গে করেছে প্রকৃতির রহস্যময় সংলগ্নতা।

গল্পগুচ্ছের তিনটি পর্বের চরিত্র লক্ষ করলে দেখা যাবে তারা সময়শাসিত। সময় এবং সমাজ তাদের প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভা এক্ষেত্রে সময়কে অতিক্রম করে গেছে। *গল্পগুচ্ছের* চরিত্র -চিন্তায় তাঁর বোধ,প্রজ্ঞা,মেধা সতত রূপান্তরশীল। সেকারণে তাঁর চরিত্রও হয়েছে রূপান্তরিত, হয়েছে স্বাধীনচেতা,

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিকামী। এ মুক্তিকামিতা রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোড়াতেই ছিল প্রোথিত। সময়ের ব্যবধানে যার সাহচর্য সে মুক্তিকামিতা অধিকতর প্রবল করেছে-জীয়ন কাঠির মতো জাগিয়ে দিয়েছে, তার নাম 'সবুজপত্র'(১৯১৪)। প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) অবাধ প্রবহমান চলিত গদ্যের স্বচ্ছন্দ গতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। ভাষা, ছন্দ, গদ্যরীতির এই গতিময়তাকে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ''স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪) সেই ঐতিহাসিক রচনা, যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ গতি পরিবর্তন করেছেন। সে পরিবর্তন যেমন আঙ্গিকগতভাবে তেমনি ভাষাগত দিক থেকে। ----- একটি অখন্ড পত্রকে ছোট গল্পাধারে রূপান্তর করার অভিনবত্বে 'স্ত্রীর পত্র' অনন্য'।২১ আর চরিত্র সৃজনের ক্ষেত্রে সচেতন, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, মুক্তিকামী নারী-পুরুষের চিত্র -সেও এই সবুজপত্র যুগেরই প্রভাবে, বলা যায়।

চলিত ভাষারীতিকে অবলম্বন করে গদ্যের মুক্তিঘটালেন রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র' থেকেই। সবুজ পত্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর কত গভীরভাবে সক্রিয় ছিল তা উপলব্ধি করা যাবে সমালোচকের বক্তব্যে : ''সবুজপত্রে' মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; অবিরলতায় যদিও কোথাও ফাঁক নেই, তবু নদীর স্রোত তীব্র বাঁক নিলো এখানে, 'সবুজ পত্রে'র আগে এবং পরে যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই। সে-সময়ে পুরানো কূল ছাড়লেন তিনি, বহুদিনের অভ্যাসের বেড়ী ভাঙলেন, যে কূল ছেড়ে গেলেন সেখানে আর ফিরলেন না।' ২২

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলোর পরিবেশ, সমাজ,ভাষা,চরিত্রের বিবর্তন,স্বকীয়তা সবুজ পত্রের স্পর্শে যেন নতুন প্রাণ পেল। নতুন গতি, নতুন প্রাণ কেবল গদ্যের ক্ষেত্রেই নয়, গল্পের চরিত্রের ক্ষেত্রেও তা অনিবার্যভাবে সত্য। 'স্ত্রীরপত্র' থেকেই নারী সচেতনতা এবং নারী মুক্তির গান শোনা যাবে। সে সুর অনেক আগেই প্রথম পর্বের (১৮৯১-১৯০০) গল্পগুলোর মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে (শাস্তি, কঙ্কাল, দেনাপাওনা, দিদি)। কিন্তু সেখানে নারী পুরুষের প্রতারণা ,হঠকারিতা, অত্যাচার,নিপীড়নের প্রতিবাদে মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি খুঁজেছে। মুক্তিকামী নারী সেখানে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে। কিন্তু তৃতীয় পর্বে এসে (১৯১৪-১৯৪০) নারী পুরুষশাসিত সমাজে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিপীড়িত হয়ে আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেনি, 'সবুজ পত্রের' যুগে এসে তারা হয়ে উঠেছে জীবনমুখী---বেঁচে থাকার মন্ত্রে তারা উজ্জীবিত পুরুষের সাথে সম্পর্কহীন হয়েছে স্বেচ্ছায়, কিন্তু স্বনিরূপিত পথে পা বাড়িয়েছে পরম সাহসিকতায় আনন্দী-মৃণাল-কল্যাণী-অনিলা-সোহিনী-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এ তেজস্বী, ব্যক্তিময়ী নারীদের নিঃসঙ্গ হবার ইতিহাসকে যে প্রথম ধারণ করেছে, তার নাম চারুলতা (১৯০১)। 'সবুজপত্র' যুগের নারীদের সংস্কারমুক্তির উদ্দীপনা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, আত্মসচেতনতা, সৃজনশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ ঘটে প্রাক-সবুজপত্র যুগের চারুলতার মধ্যে দিয়েই। এ যেন সেই 'সন্ধ্যেবেলায় দীপ জ্বালানোর আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো' র মতো। 'চারুলতা' সেই উৎসের নাম যেখান থেকে সবুজপত্র যুগের নায়িকারা হয়ে উঠেছে স্রোতস্বিনী।

Dhaka University Institutional Repository

৫

নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে বিচিত্র নিরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ *গল্পগুচ্ছে*। নারীর অতলান্তিক মনের রহস্যময়তা পুরুষচিত্তের আগ্রহ -অনাগ্রহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে,পরিবর্তিত হয়েছে। নারীর ভাষ্যে পুরুষের মানসিক ঔদার্য,সংকীর্ণতা কিংবা সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে *গল্পগুচ্ছের* বর্ণনায়। আবার, পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা, নারীর মূল্যায়ণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কোন কোন গল্পে। আবার কখনো বা যন্ত্রণা, বেদনা, সুখানুভূতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিজনিত মানসিক অবস্থা পরস্পারের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে। বিশ শতকের যুগযন্ত্রণা, বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজ, সংস্কৃতি,দর্শনের, ভাঙ্গা-গড়ার অমোঘ পরিণতি গল্পগুচ্ছের নারী-পুরুষকে আক্রমণ করেছে অনিবার্যভাবে।

জৈবিক অচরিতার্থতাজনিত অস্থিরতা পুরুষকে কীভাবে ক্রমে বিপথগামী করে তোলে, স্ত্রীর সারল্যের সুযোগ নিয়ে প্রতারণার চাতুর্যে পুরুষ কীভাবে ক্রমে নিজেকেই গ্রাস করে, আপন সত্তাকে ক্রমে বিকারগ্রস্ত করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় 'নিশীথে' (১৮৯৪) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর জমিদার দক্ষিনাচরণ দ্বিতীয় স্ত্রীকে যখন একই স্থানে একই সময়ে একই কথা ব্যক্ত করেছে তখনই ভীত-সন্ত্রস্ত অস্থিরতা তাকে গ্রাস করেছে। নিরস্তিত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়ার সূত্রপাত তার তখন থেকেই :

> ''এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখর দেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল;তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহন করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম,''মনোরমা তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোন কালে ভুলিতে পারিবনা।
>
> কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল,ঠিক এই কথাটা আর একদিন আর কাহকেও বলিয়াছি। এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপাড় হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপাড় পর্যন্ত হাহা-হাহা-হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার বলিতে পারিনা আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।''২৩

জৈবিক অচরিতার্থতাজনিত যন্ত্রণা পুরুষকে যেমন অস্তিত্বহীন,উন্মূলিত করেছে, তেমনি নারীও পুরুষের অসচেতনতায়, উপেক্ষায় হয়েছে বঞ্চিত;এ বঞ্চনা নারীর জীবনকে করে তুলেছে বিকারগ্রস্ত, অতৃপ্ত, শূন্য। 'তপস্বিনী' (১৯১৭) গল্পে তার পরিচয়:

Dhaka University Institutional Repository

যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ-পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাস্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল, যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক পূর্বের সৃষ্টি, যার রঙের সঙ্গে ধ্বনির সঙ্গে গন্ধের সঙ্গে হৃদয়ের খাসমহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে - ষোড়শী তো কৃচ্ছ সাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজও সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

----- সে দিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যেন তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এ আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষমাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।'' ২৪

ষোড়শীর এ তপস্যা, লংচু পাহাড়ের হাওয়ার উপলব্ধি একদিকে যেমন তার বিকারগ্রস্ত মানস পরিণতির পরিচায়ক, অপরদিকে তা ষোড়শীর জীবনের শূণ্যতারই দ্যোতক।

জৈবিক তাড়না নারী-পুরুষকে যে কীভাবে পরিচালিত করে,পরিবর্তিত করে, তার আরেক প্রমাণ পাওয়া যাবে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে। 'ষোড়শী'র মত এ গল্পেও জৈবিক বাসনাই নর-নারীর জীবনকে করেছে বিবর্তিত,বেদনাময়। শারীরিক অসুস্থতা, অক্ষমতার কারণে হরসুন্দরী মোহময় প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে উদ্বোধিত হয়েছে।

কিন্তু ''দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ রক্তহীন পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সে দিন শুক্লদ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখা মাত্র ছিল; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল, ''আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে'। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চঃস্বরে কহিল, 'তুমিতো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবী আমরা ছাড়িব না'।২৫

যে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হরসুন্দরী স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, সেই শক্তির কাছেই সে হয়েছে পরাভূত। বস্তুত এটি হরসুন্দরীর জৈবিক অচরিতার্থতাজনিত মনোকথন। জমিদার দক্ষিনাচরণবাবুও (নিশীথে) এই জৈবিক আকর্ষনেই মনোরমাকে বিয়ে করেছিল। প্রথমা স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা, রুগ্নতা তাকে ক্রমে অন্য নারীতে আসক্ত করে তোলে। এপ্রসঙ্গে গল্পাংশ স্মর্তব্য :

Dhaka University Institutional Repository

> 'মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।'২৬

বিপরীত সত্তার প্রতি চিরন্তন এ আকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারেনি আনন্দীও (বোষ্টমী)। স্বামী-পুত্রের অকৃত্রিম ভালোবাসায় পূর্ণা আনন্দী গুরুঠাকুরের রূপে বিমুগ্ধ। যেদিন গুরুঠাকুর তাকে 'ভিজা কাপড়ে' নিরীক্ষণ করে বলেছে 'তোমার দেহখানি সুন্দর', সেদিনই সে উপলব্ধি করেছে 'গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল।'২৭ এই 'চুরি' সেই শাশ্বত শক্তি, আনন্দীকে যা তাড়িত করেছে ——

> ''মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলু থালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ী গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুর ঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না---সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুমকিগুলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।২৮

আত্মজৈবনিক অচরিতার্থতার এ উপলব্ধি আনন্দীকে স্বামী পরিত্যাগ করতে উদ্বোধিত করেছে। কেননা স্বামী -পুত্রের ভালোবাসার নির্মলতা বজায় রাখতে এ সিদ্ধান্ত ছিল তার অনিবার্য পরিণতি। গুরুঠাকুরের প্রতি তার দেহজ কামনা-বাসনা উপলব্ধি করেই 'মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়লো-পাতিব্রত্য আর সতীত্ব-সাধনার আস্তরণ। ইঙ্গিতে-রূপকে-ইমেজে আনন্দীর অভাবিতপূর্ব আত্মআবিষ্কারের 'মহামুহূর্ত'কে প্রকৃতির শুশ্রূষায় অসামান্য রূপে শিল্পিত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।'২৯

পয়লা নম্বর (১৯১৪) গল্পেও অনিলার নিরুদ্দেশ হবার পর স্বামী-অদ্বৈতচরণ উপলব্ধি করতে পারে সেই শাশ্বত আকর্ষণ-নর-নারী সম্পর্কের আদিমতম স্বরূপ--'হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল।'৩০

স্ত্রীর প্রতি উদাসীন, দায়িত্ব-কর্তব্যহীন অদ্বৈতচরণ অনিলাকে হারিয়ে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। যতক্ষণ স্ত্রী কাছে ছিল, তার মর্যাদা সে দেয়নি। যেইমাত্র দূরে চলে গেছে, তখনই স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে সে। মানব মনের এ আদিমতম আকর্ষণ নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারণে এভাবেই বহন করে চলেছে অনিবার্য ভূমিকা।

৬

উনিশ শতকীয় সমাজ-সময়ে পুরুষের যে আধিপত্য ছিল নারী তার কাছে ছিল অসহায়। অনেকটা পুরুষের দয়া বা করুণা কামনাতেই ছিল নারীর দাম্পত্য জীবনে যাত্রারম্ভ।. আর যেহেতু হিন্দু বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

আইন ছিল পুরুষের পক্ষে, নারীর স্বামী পরিত্যাগ করার বিষয়টি ছিল তাই অকল্পনীয়। যদিও প্রান্ত পর্বে (১৯১৪-১৯৪০) এসে আনন্দী-মৃণাল-অনিলা সে দুঃসাহস দেখিয়েছে -- কিন্তু তা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ-সময়ের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-ভাবনার প্রাগ্রসরতার নিদর্শন। বিবাহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের-অভিমত এখানে স্মর্তব্য :

> ''আমদের বিবাহ সামজিক বলিয়াই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। ----------পুরুষ শাস্ত্রচর্চাবান এবং স্ত্রী শাস্ত্রচর্চাহীন মন্ত্রহীন হয়, ইংরেজী মতে ইহা প্রার্থনীয় নহে। বিবাহে স্ত্রী পুরুষের একীকরণ ইংরেজী বিবাহের উচ্চ আদর্শ। কিন্তু সে--একীকরণ সর্বাঙ্গীন একীকরণ-কেবল সাংসারিক একীকরণনহে , মানসিক একীকরণ----------।
> আমরা স্ত্রীকে সহধর্মিনী নাম দিয়া থাকি বটে, কিন্তু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই,; কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন। ইহাকে উচিতমতে স্বামীর সহিত সহধর্ম বলা যায় না। ----------
> যদি আমার সম্পূর্ণতা লাভের জন্য, আমার সমগ্র মানব প্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য আমি স্ত্রী চাই, তবে তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান করিলেই যে সকল সময়েই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া যাইবে, এমন কোনো কথাই নাই। কিন্তু সন্ধানপূর্বক বিবেচনাপূর্বক সংযতচিত্তে স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লওয়া ছাড়া ইহার অন্য কোন পন্থা নাই।''৩১

প্রথম পর্বে (১৮৯১-১৯০০) অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ দশকের সমাজ-সময়ে অবয়বটি ছিল ভিন্ন। এখানে স্ত্রীর জীবদ্দশাতে স্বামীর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ দেখা যায় না বললেই চলে; কিন্তু স্ত্রীকে নির্যাতন করে,আন্তরিকতার অভাব ঘটিয়ে প্রকারান্তরে স্ত্রীকে হত্যা করে দ্বিতীয় নারীকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করবার ঘটনা প্রায়শই দেখা যাবে। 'দেনা-পাওনা', 'হৈমন্তী', প্রভৃতি গল্পে যৌতুক প্রথার মর্মান্তিক পরিণতি, নারীর মানসিক যাতনা পুরুষের ছল-চাতুরিজনিত প্রতারণা নারীকে নিরবলম্ব করেছে, নারী হয়েছে নিঃসঙ্গ,উন্মূলিত। স্বামীর প্রতারণার কোন সরব প্রতিবাদ না করে নারী এখানে নীরব -নিঃসঙ্গভাবে আত্মবিসর্জন দিয়েছে, পরিত্যাগ করেছে ব্যক্তিত্বহীন, প্রতারক স্বামীকে। কিন্তু নারীর এ আত্মবিসর্জন পরবর্তীতে বিবেকের দংশন জাগ্রত করে কীভাবে পুরুষের জীবনকে বিপর্যস্ত, মানসিক বিকারগ্রস্ত করে তুলতে পারে, 'নিশীথে' গল্পে তার পরিচয় আছে। যদিও এ গল্পে নারীর শারীরিক অসুস্থতা, অক্ষমতা পুরুষকে উদ্বোধিত করেছে দ্বিতীয় দার গ্রহণে, তথাপি ব্যক্তিত্বহীনতার অভাবে ছলনা, মিথ্যাচার, স্ত্রীর প্রতি ঔদাসীন্য তাকে অপরাধী করে তুলেছে। এই বিবেক-তাড়িত অপরাধবোধ এ গল্পের পুরুষ চরিত্র-জমিদার দক্ষিনাচরণবাবুকে শঙ্কিত, বিকারগ্রস্ত, অসুস্থ করে তোলে। এতো গেল স্ত্রীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে উন্মূলিত -নিঃসঙ্গ পুরুষ চরিত্রের কথা। কিন্তু স্ত্রীর জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ কীভাবে নারী-পুরুষ উভয়কেই নিঃসঙ্গ,বিচ্ছিন্ন করে দেয় 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে আছে তার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার অনন্য নিদর্শন। যদিও এ গল্পেও নারীর শারীরিক অক্ষমতাই পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ের কারণ, কিন্তু নারীর প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

ছলনা, উপেক্ষা, অমর্যাদা মিথ্যাচার পুরুষকে যেভাবে বিবেকের কাছে পরাভূত করেছে, ব্যক্তিত্বহীন করেছে, প্রকারান্তরে তা আত্ম-ছলনারই নামান্তর। শৈলবালার মৃত্যুর পর হরসুন্দরীর কক্ষে নিবারণকে 'চির অধিকারের মধ্যে চোরের মত প্রবেশ'৩২ করতে হয়। কিন্তু এখানেই তার শাস্তির শেষ নয়। আত্ম-অপরাধবোধ তাকে আর কখনোই হরসুন্দরীর কাছে স্বাভাবিক, সহজ হতে দেয়নি। হরসুন্দরীও তাকে আর হৃদয়ে স্থান দিতে পারেনি। তাই 'উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, কেহ তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারিল না'।৩৩ স্বামী -স্ত্রীর মাঝখানে তৃতীয় নারী নির্মাণ করেছে অন্তহীন দূরত্ব। পুরুষের মোহের কাছে এক সময় যে নারী ছিল 'মাধবী লতাটির মতো', মোহভঙ্গের পরে সেই নারী হয়ে ওঠে 'উদ্বন্ধনরজ্জু'। এই রজ্জু নিবারণ ছিন্ন করতে পারেনি কখনো।

শিক্ষায়, বয়সে, মানসিকতায় অসামঞ্জস্য *গল্পগুচ্ছের* নর-নারী সম্পর্ক বিকলনের অন্যতম কারণ। এ অসমতা তিন পর্বের গল্পেই কম-বেশী দেখা যাবে। এই অসমতার কারণেই নারী-পুরষের সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা হয়নি শেষ পর্যন্ত। শিক্ষা এবং বয়সগত রুচিগত ব্যবধানের অসম-পুরুষের সাথে সম্পর্কিত হয়েই উনিশ শতকের অধিকাংশ নায়িকাদের দাম্পত্য-জীবনের সূত্রপাত। অবশ্য বিশ শতকের প্রথম দশকের চারুলতা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের মনি এবং ষোড়শীও এ অসামঞ্জস্যের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত নয়। উনিশ শতকের কনকচাঁপা-শৈলবালা-গিরিবালা (মেঘ ও রৌদ্র) গ্রামীণ পরিবেশে লালিত, স্বল্পশিক্ষিত, সরল। কনকচাঁপা বালিকা, বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, বর্ণনা থেকে অনুমতি হয়। গল্পে কনকচাঁপার শিক্ষার কোন ইতিহাস নেই বটে তবে আত্মসচেতনতা, আত্মসম্মানবোধের তীক্ষ্ণতায় সে বিশিষ্ট। বাল্যবিবাহ এবং অকাল -বৈধব্য তাকে অতৃপ্ত,তৃষ্ণার্ত করেছে। বাল্য বয়সে যখন তার বিয়ে হয়, তখন অনাগত যৌবন-তৃষ্ণা ছিল তার অজানা। স্বামী পুরুষটি তখন তার কাছে কেমন ভীতিকর, দুর্বিসহ ছিল রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প বর্ণনায় তা অনুধাবন করা যাবে------

> 'যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোট ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মত ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ কোন্ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্ম জলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে-কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুইমাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং -------।'৩৪

কনকচাঁপা যখন ছাব্বিশ বছরের রূপসী রমণী, তখন সে বিধবা। অসম বিয়ের কারণে বৈধব্যকে বরণ করে নিয়ে সে জীবন তৃষ্ণা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভ্রাতৃ-বন্ধু ডাক্তার শশিশেখরকে আশ্রয় করে তার ভালোবাসা বেড়ে উঠেছে। কিন্তু তা পরিণত রূপ লাভ করেনি। ফলে আত্ম-পীড়িত, বঞ্চিত, অপমানিত এ নারীর কাছে জীবন হয়ে উঠেছে শুণ্য নিরর্থক।

Dhaka University Institutional Repository

আট বছর বয়সে বিয়ে হয় হরসুন্দরীর। স্বামী নিবারণও তখন 'বালক'। এই বাল্য বিবাহ তাদের দুজনের প্রতি দুজনকে 'চিরপরিচিত', 'চিরাভ্যস্ত' করেছে। 'যেমন পরিচিত পুরাতন চটি-জোড়াটার মধ্যে পা দুটো দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে----৩৫।' স্ত্রীকে সে ভালোবাসত, কিন্তু তা ছিল 'চিরপুরাতন', যৌবনের আগমনে সঞ্চারিত সচেতন প্রেম নয় সেটি। নিবারণ যখন ম্যাকমোরান কোম্পানীর হেডবাবু, বয়স যখন প্রৌঢ়ত্বের দিকে হেলে পড়েছে তখন সে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করেছে 'একটি নোলক-পরা অশ্রুভরা ছোটখাটো মেয়ে'৩৬ শৈলবালাকে। বয়সের এ অসমতা নিবারণের দাম্পত্য জীবনকে অস্থির, যন্ত্রণাময় করে তুলেছে। শৈলবালার বালিকাসুলভ আবদার, আচরণ নিবারণকে যেমন ব্যক্তিত্বহীন করে তুলেছে তেমনি তাকে রিক্ত, নিঃস্ব, নিঃসঙ্গও করেছে। নিবারণ শৈলবালাকে হারিয়েছে, হরসুন্দরীর সাথেও তার তৈরী হয়েছে অলঙ্ঘ্যনীয় দূরত্ব। বাল্য বিবাহ শৈলবালার জীবনকে করেছে নিষ্ফল,অসম্পূর্ণ 'সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল'।৩৭

গিরিবালার সাথে শশিভূষণের যখন পরিচয়, তখন তার বয়স আট বছর। শশিভূষণ তখন এম. এ বি এল. পাশ করা নব্য যুবক। বয়সের এই বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি মানসিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। দশম বর্ষীয়া এ বালিকার যখন অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায় তখন শশিভূষণের মনের অবস্থা :

> ''গ্রামের সহিত তাহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষচূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎ সংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়ানির্মিত মায়া মরীচিকার মতো অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।----------৩৮ (সপ্তম পরিচ্ছেদ)

শশিভূষণের স্নেহ, বন্ধুসুলভ সাহচর্য দশ বছরের গিরিবালার মনকে আকৃষ্ট করেছিল বটে কিন্তু অন্যত্র বিয়ে তার এ আন্তরিক আকর্ষণকে বেড়ে উঠতে দেয়নি। বয়সে বালিকা হবার কারণে সে সুযোগও তার ছিলনা। কিন্তু অকাল বৈধব্যের পর শশিভূষণকে জেলখানা থেকে ভৃত্য পাঠিয়ে নিজ বাড়ীতে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া, আপ্যায়ন থেকে অনুমান করা যায় যে গিরিবালা তার শশিদাদার স্মৃতিকে লালন করেছে সযত্নে এবং সেটি যে এই পাঁচ বছর পর গিরিবালার হৃদয়ে ভালোবাসার সঞ্চার করেছে তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে তার সেই শশিদাদার স্মৃতি বিজড়িত বিদীর্ণ শ্লেট, গুটিকয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশিরাম দাসের মহাভারত সংরক্ষণের সাগ্রহে। পাঁচ বছর ধরে

Dhaka University Institutional Repository

শশিভূশণের হস্তাক্ষরে লেখা 'গিরিবালা দেবী' সম্বলিত এসব স্মৃতি সংরক্ষণ তার লালিত এবং বিকশিত প্রেমেরই পরিচয় বহন করে। কিন্তু 'নিরাভরণা', 'শুভ্রবসনা', গিরিবালা অকাল বৈধব্যের কষাঘাতে বেদনার্ত, বঞ্চিত,রিক্ত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

বাকহীনতার কথা গোপন করে সুভার বিয়ে তার অসহায় জীবনকে আরও করুণ, অনিশ্চয়তার সম্মুখীন করেছে। এটিও একটি অসম-বিবাহ বললে অত্যুক্তি হয়না।

বিশ শতকের চারুলতা স্বামী গৃহে আগমন করেছে বাল্য বয়সেই। স্বামী বিত্তবান, খবরের কাগজের ব্যস্ত সম্পাদক। 'সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পর্দাপন করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না'। ৩৯ স্বামী-স্ত্রীর মানস ব্যবধানের সূত্রপাত এখান থেকেই। ভূপতির ব্যস্ততা, উদাসীনতা, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যহীনতা চারুলতার অন্তর্জ্বালাকে ক্রমশ: বাড়িয়েছে। ফলে চারুর ব্যক্তিসত্তা নৈঃসঙ্গ্যের গহবরে নিপতিত হয়েছে। সেখান থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে সে দেবর অমলকে আশ্রয় করে। অমলের সাথে এ সম্পর্ক প্রেমে সমর্পিত হয়। কিন্তু আত্ম-অপরাধবোধে পীড়িত অমলকে আত্মশুদ্ধির কথা চিন্তা করে দূরে সরে পড়তে হয়। এ বিচ্ছেদ চারুলতার জন্য 'মৃতভার'-এর সমান। কেননা চারুলতার মন ছিল অমলের প্রতি সমর্পিত------- ''আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব''।৪০ অসম-বিবাহ-উৎসারিত এ যন্ত্রণা ভূপতি-চারুলতা উভয়ের জীবনকেই করেছে দুর্বহ। স্বামী-স্ত্রী হয়েও উভয়ের জীবন হয়ে ওঠে 'নিঃসম্পর্ক লোকের মত'।৪১

অসম বিয়ের দুঃসহ অবস্থা থেকে যতীন-মণিও (শেষের রাত্রি) মুক্তি পায়নি। গল্পে মণির ছেলেমানুষি, চাঞ্চল্য, কাজে-বুদ্ধিতে অনভিজ্ঞতা তার স্বল্প বয়সকে নির্দেশিত করে। আর যতীনের স্ত্রীকে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা, মন পাবার সাধনা, দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা উপলব্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলো যতীনের মধ্য বয়সোচিত মানসিকতার পরিচয়বাহী। স্বামীর রুগ্নতা, কিশোরী মণিকে করে তোলে উদাসীন, সংসার বিমুখ। অসুস্থ স্বামীকে ফেলে রেখে কনিষ্ঠা ভগ্নীর অন্নপ্রাশণে যাওয়া তার কাছে অনিবার্য হয়ে ওঠে। অসম বয়স দুজনকে দুই প্রান্তে স্থাপন করেছে। 'দুই যন্ত্র দুই সুরে বাধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন'। ৪২ স্বামীর প্রতি প্রেমে, আন্তরিকতায় তাই বৈষম্য নেমে আসে। এ বৈষম্যের পথ বেয়েই মণি চিরকাল যতীনের 'ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল'।-৪৩ 'কিছুতেই ঢুকতে পারলনা'। বাল্য বিবাহের অসামঞ্জস্যতার কারণে মণিকেও শেষপর্যন্ত বৈধব্য-বেশকে বরণ করে নিতে হয়।

বি.এ পড়ুয়া বরদা যখন বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়, তখন তার স্ত্রী ষোড়শী 'সবেমাত্র ত্রয়োদশী'। শ্বশুরালয়ে সে তখন পর্যন্ত 'খুকি' বলে সম্বোধিতা। ক্রমে পঞ্চদশী ষোড়শী যৌবনে পর্দাপণ করেছে,স্বামী তখনও নিরুদ্দিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

'ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারিদিকে যেন আঁটিয়া ধরে,তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্‌নাটা, আলমারিটাতার জীবনের শূণ্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে'।-৪৪

অন্তরের এ শূণ্যতা ষোড়শীর সংসার,জীবন সবকিছুকে শূণ্য করে দিয়েছে। স্বামী-বিচ্ছেদে কাতরা ষোড়শী এই শূণ্যময়তার মধ্যেই অন্বেষণ করেছে স্বামীকে, সে অন্বেষণ যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি কঠোর। বাল্য বিবাহের ঔদাসীন্য, প্রাক যৌবনের স্বামী-বিচ্ছেদজনিত নৈঃসঙ্গ্য এবং যৌবনস্মোচিত চিত্তাকাঙ্ক্ষা ষোড়শীর অন্তর্জ্বালাকে বাড়িয়েছে, দহন করেছে। ফলে ষোড়শী-হয়েছে বিকারগ্রস্ত। লংচু পাহাড়ে ধ্যানমগ্ন স্বামীকে আয়নার সাদা প্রতিবিম্বে অবলোকন করা বিকারগ্রস্ত ষোড়শীর 'হ্যালুসিনেশন' ছাড়া আর কিছু নয়।

৭

উনিশ শতকীয় সমাজে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল পুরুষের। নারী স্বাধীনতা এ সমাজে অবরুদ্ধ হয়েছে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে নারীর এ অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। রেনেসাঁসের সুবাতাস এ সমাজে নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতার মতো কতগুলো সুযোগকে স্বীকার করে নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথও 'কালান্তর' (১৯৩৭) এ সেকথা ঘোষণা করেছেন :

''কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই-যে মুক্ত সংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্র মেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি, বাটনা-বাটা, কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয় । ---------- ---------- একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, গল্পান্তের ভূমিকায় নতূন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে---প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়- যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে মানব সমাজে তারা জন্মেছে, সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবেনা। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে''৪৫

গুল্পগুচ্ছের তিনটি পর্বেই সময়ের এ পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা যাবে। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে নারী এখানে আর পরজীবী নয়, হয়ে উঠেছে কর্মজীবী। পুরুষের পাশাপাশি নারীও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে ক্রমশ। গৃহপরিচারিকা রতনের মধ্যে দিয়ে *গল্পগুচ্ছের* কর্মজীবী নারীর এ শুভযাত্রার সূচনা।

উলাপুর গ্রামের বারো-তেরো বছরের বালিকা রতন অনাথ, পিতৃ-মাতৃহীন। দুর্ভাগ্য এবং দারিদ্র্য তার সহচর। উনিশ শতকের সমাজ তাকে ঠেলে দিয়েছে জীবিকা অন্বেষণের পথে। যে বয়সে তার বই নিয়ে বিদ্যালয়ে যাবার কথা, সে বয়সে সে গৃহপরিচারিকা। গ্রামের স্বল্প বেতনভুক পোস্টমাস্টার তার মনিব। যদিও গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পোস্টমাস্টারের কাছে তার বর্ণ পরিচয় ঘটেছে, তথাপি এও স্বীকার্য যে তা ছিল মনিবের নিতান্তই নিঃসঙ্গসময় কাটানোর উপায়মাত্র। নব্য শিক্ষিত বাঙালি পোস্টমাস্টার কোলকাতা নগরী ছেড়ে চাকরির সুবাদে উলাপুর গ্রামে এসে অবরুদ্ধ প্রায়। নৈঃসঙ্গ্যের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে সে বেছে নেয় গৃহপরিচারিকা রতনকে। তাকে পড়ানো, পারিবারিক গল্প করে সময় কাটানো, স্নেহ-ভালোবাসা-সবকিছুই ছিল পোস্টমাস্টারের ব্যক্তিক স্বার্থে। সে স্বার্থের কাছে রতনের বালিকা হৃদয়ের ভালোবাসা মূল্যহীন হয়েছে। এমনকি শিশু শ্রমের সারল্য, আন্তরিকতার কাছেও পোস্টমাস্টার 'প্রভু'।--৪৬ রুটি সেঁকা, তামাক সাজানো, নদী থেকে স্নানের জল তুলে আনা, প্রভৃতি কাজ ছাড়াও অসুস্থ পোস্টমাস্টারের প্রতি জননী সুলভ সেবা প্রদানও পোস্টমাস্টারের কাছে পরিচারিকার কাজের অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে হয়। সে কারণে আরোগ্য লাভের পরও রতন ভৃত্যই থেকে যায়। পোস্টমাস্টারের হৃদয়ে তার কোন স্থান হয়না : ''রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্ব স্থান অধিকার করিল।''--৪৭ রতন গ্রাম্য বালিকা, সহজ, সরল। সেকারণে তার কাজের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই, আন্তরিকতার অভাব নেই। আত্মসম্মানবোধ তাকে বিশিষ্ট করেছে। পোস্টমাস্টারের সাথে কোলকাতা যেতে চাইলে 'প্রভু' তা সহাস্যে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রভুসুলভ মানসিকতার কারণেই 'ব্যাপরটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বোঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না'।--৪৮ কিন্তু সহাস্য এই প্রত্যাখ্যান কোমল-হৃদয় বালিকার সুকুমার অনুভূতি এবং আত্মসম্মানবোধে কেমন আঘাত করেছিলো, তার প্রমাণ ''সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনীর কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল ---- 'সে কী করে হবে'।--৪৯ অতঃপর প্রভুর কাছে তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। শুরু হয়েছে ভৃত্য রতনের কর্মময়তা: 'ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে, কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সেকথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এই জন্য রতন তত রাতে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল।

Dhaka University Institutional Repository

রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল''।---৫০ পরিবেশ এবং বয়সোচিত সারল্যে রতন আবেগপ্রবণ। উপরন্তু জীবিকার তাড়নায় কর্মরত বলেই একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় তার সহজাত প্রত্যাশা। পোস্টমাস্টারের কাছে সে আশ্রয় প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আহত হৃদয় এবং আত্মসম্মানবোধের চেতনা তাকে পোস্টমাস্টার কর্তৃক দেয় দয়া এবং অনুদান প্রত্যাখ্যান করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সকরুণ কান্না বিজড়িত, 'জগতের ক্রোড় বিচ্যুত'--৫১ কর্মজীবী এ ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রত্যাশার পাশে পোস্টমাস্টারের সেই তত্ত্ব 'পৃথিবীতে কে কাহার'--৫২ বিকাশমান পুঁজিবাদী সভ্যতার নির্মম বৈষম্য ও অসমতাকে নির্দেশ করে । শোষণ আর স্বার্থবাদী এ সমাজে রতনের মতো ছিন্নমুল মেয়েরা এভাবেই শ্রমজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, মুখোমুখি হয় কঠোর বাস্তবতার।গল্পের শেষে অশ্রুমুখী রতনের প্রতি লেখকের উক্তি --'হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচেনা, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহু পাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে ,তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে''।--৫৩)

জীবিকার জন্য পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেও মানবিক মুল্যবোধ বিবর্জিত হতে পারেনি ক্ষীরোদা (বিচারক)। চৌদ্দ-পনের বছরের বিধবা কন্যা হেমশশী -কাঁচা বয়সের উদ্দামতায়, দুর্দান্ত আবেগে বিনোদচন্দ্র-ছদ্মনামধারী-মোহিতের হাত ধরে গৃহত্যাগ করেছে। মোহিত তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে হেমশশীকে পরিত্যাগ করে প্রস্থানকরে। হেমশশী-কলঙ্কের কালিমা মাথায় নিয়ে ক্ষীরোদা নাম ধারণ করে 'আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত' হয়।--৫৪ আত্মগ্লানি, কলঙ্ক,তার গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলো।'অন্নমুষ্টির জন্য'--৫৫ এ নারী হয়ে ওঠে 'যৌবনমদ মত্তা'--৫৬
উপায়ান্তর না দেখে পতিতাবৃত্তিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষীরোদা কী পরিমান অর্ন্তজ্বালাকে লালন করেছে, কত প্রতারক দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে তার প্রমাণ গল্পে আছে: 'অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও তাহাকে দীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল''।--৫৭

প্রেমিকের প্রতারণা, মনুষ্যত্বহীনতা তাকে পঙ্কিলতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছে। এ পঙ্ক তা র জীবনকে বিমুখ করে। কিন্তু জীবন ও মাতৃত্বের কাছে পরাজিত হয় সে। তিন বিছরের শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে আত্মবিসর্জন দিতে গিয়ে পুত্রকে হারাতে হয়েছে তার। সমাজের বঞ্চনা, পুরুষের প্রতারণা, ঘৃণা পতিতা এ নারীর জীবনকে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত করেছে, নিঃসঙ্গ করেছে, কিন্তু 'পঙ্কজ'কে মলিন করতে পারেনি এতটুকু। প্রতারক বিনোদচন্দ্রের দেয়া আংটি সযত্নে লালন করে সে তার প্রথম ভালোবাসর পঙ্কজ

Dhaka University Institutional Repository

ফুটিয়েছে। জজ মোহিত মোহনদত্তের সামনে দেহজীবী এ নারীর মহিমা তার পেশাকে মলিন করে দিয়েছে, 'কলঙ্কিনী-পতিতা-রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্নীঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত' হয়ে উঠেছে।--৫৮ ক্ষুদ্র আংটির উজ্জ্বলতার মধ্যে যেমন পতিতার মহিমা দেবীপ্রতিমার বিশালতায় ধরা পড়েছে, সমাজের নিম্নতম স্তরের পেশা-দেহব্যবসার মধ্যেও তেমনি 'জীবন-চেতনা'র-৫৯ শাশ্বত প্রকাশ এ নারীকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

জীবনে সচলতার সন্ধানে স্বাবলম্বী নারীদের তালিকায় কল্যাণী (অপরিচিতা) বিশিষ্ট। শিক্ষায়, ব্যক্তিত্বে, কর্মে সে প্রাঞ্জল, নির্মল। এম.এ পাশ পাত্রের সঙ্গে বিয়ের আসরে গহনা যাচাই করার ঘটনাকেকেন্দ্র করে বিয়ে ভেঙে যায় কল্যাণীর। পাত্র অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার কাছে স্বমহিমাকে তুলে ধরেছে কল্যাণী । পুরুষ- -তান্ত্রিক সমাজে মেয়েকে পণ্যের দরে যাচাইয়ের মত গর্হিত কাজকে সে সমর্থন করতে পারেনি, ক্ষমা করতে পারেনি কখনো। তাই বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর বিচলিত না হয়ে আপন ব্যক্তিত্বে আত্মপ্রকাশ করেছে সে। নারী শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছে দেশ ও নারীর কল্যাণে নিজের চলার পথকে তৈরী করে নিয়েছে সে। জীবনের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে শিক্ষাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এ নারী হয়েছে পথ প্রদর্শক, স্বাবলম্বী । এভাবেই কল্যাণী হয়ে ওঠে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। নায়কের স্বীকারোক্তিতে তার প্রমাণ মিলবে: ''তোমরা মনে করিতেছ আমি বিবাহের আশা করি। না কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা-জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় -আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, কণ্ঠশুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই আর মন বলে এইতো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইলনা, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি''।--৬০

ট্রাস্টির মাধ্যমে পিতার দেয়া বিষয় -সম্পত্তি থেকে মাসোহারা পায় বিভা। ট্রাস্টিদের মধ্যে বিভার মামা শিক্ষাখাতে ট্রাস্টফান্ড থেকে কিছু টাকা বিভার হাতে রেখে দিয়েছেন যার থেকে বিভা মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেয়। অমরনাথ সে বৃত্তিধারীর একজন। এছাড়াও বিভা কিছু ছেলেমেয়ের শিক্ষা দানের কাজে নিয়োজিত। গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যাবে: ''বিভার কাছে যে সব ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছে ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে । আজ রবিবার। খাওয়ার পরে এতক্ষণ ওর ক্লাস বসেছিল। সকাল সকাল দিল ছুটি''।--৬১ শিক্ষিতা বিভা এভাবেই ঘরে বসে নিজেকে তৈরী করে নেয় কর্মময়ী নারী হিসেবে, যার সফল প্রতিষ্ঠা সোহিনীর (ল্যাবরেটরি) মধ্য দিয়ে দেখা যাবে।

লন্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাসকরা দেদীপ্যমান ছাত্র নন্দকিশোর মনের কষ্টিপাথরে সোহিনীকে আবিষ্কার করেছিল। যার 'ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেক্টরের তেজ-বোঝা গেল নিজের দাম

Dhaka University Institutional Repository

নিজে জানে , তাতে একটু মাত্র সংশয় নেই'। --৬২ সোহিনীও নীতিগত দৃঢ়তায় স্বামীর এ বিশ্বাসের মূল্য রক্ষা করেছিল শেষ পর্যন্ত। 'ব্রিলিয়ান্ট' এঞ্জিনিয়ার নন্দকিশোর স্ত্রীকে কেবল সাংসারিক প্রয়োজনে আবদ্ধ দেখতে চাননি। সোহিনীকে তিনি প্রস্তুত করেছেন কেবল সহধর্মিনী হিসেবে নয়, সহকর্মিনী হিসেবেও। স্ত্রীকে 'নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে'৬৩ লেগেছিলেন নন্দকিশোর।-- কেননা, তার অভিমত ছিল, 'স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী , এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছাড়াবাধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি।পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগের ব্রতের মিল করাও'।--৬৪ নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য স্ত্রী সাহস ও দৃঢ়তার সাথে সমস্ত কিছু নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সাথে তার কৌশল তাকে নিয়ে গিয়েছে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। তার সে কর্মনিপুণতার একটু পরিচয় নেওয়া যাক:

'সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যবসাদার এসে পড়ল চারদিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিল পাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিলনা। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে'।--৬৫ স্বামীর কাছে শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণতা প্রাপ্তি সোহিনীকে করেছিল কৃতজ্ঞ। স্বামীর রেখে যাওয়া সাধনামন্দির 'ল্যাবরেটরি' আর অজস্র টাকার যাতে কোন অপব্যবহার না হয় , সে দিকেই সোহিনীর সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত। সে কারণে ল্যাবরেটরির যোগ্য উত্তরাধিকার নির্বাচনে সে নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। নন্দকিশোরের বিজ্ঞানমস্কতা তাকেও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। 'বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানা-খোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর'--৬৬ জন্যে হাসপাতাল নির্মাণের ইচ্ছা তার প্রমাণ। নারীর প্রতি নন্দকিশোরের এ উদার সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছে সোহিনী:

> 'সকল রকম সায়ান্সেই আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তার নেশা ছিল বর্মা চরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চরুট প্রায় বার্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোখে খটকা লাগে। তাঁর আর এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনো খানে খাদ দেখতে পাইনি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো;আজ দূরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরও বড়ো'।--৬৭

বিদ্যানুরাগী, কৌশলী, বুদ্ধিমতী সোহিনীর সমস্ত কর্মতৎপরতা ল্যাবরেটরিকে ঘিরে। ল্যাবরেটরির যন্ত্রসমূহ ক্রয় করা, ট্রাস্টির হাতে ল্যাবরেটরির সম্পত্তি অর্পণ, জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে স্বত্ব বিচার করা, 'আইন-কানুন বেঁধে দেয়া' প্রভৃতি কর্ম-পরিকল্পনা সোহিনীর কর্মদক্ষতার

Dhaka University Institutional Repository

পরিচায়ক। স্বামীর ল্যাবরেটরিই তার ধ্যান-জ্ঞান। তাই ল্যাবরেটরির ভেতরে নির্মিত বেদীতে স্থাপন করেছে নন্দকিশোরের মূর্তি। প্রত্যহ সেখানে চলে ফুল-ফল সহকারে ধূপ-ধুনোর অর্চনা। ট্রাস্টি সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত ডঃ রেবতী ভট্টচার্যকে সে বলে :

> 'পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নিচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন-পাশে বললে মিথ্যে হবে, তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়ে-জামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি। বললেন, ঐখানে রেখে গেলাম আমার সম্পত্তি আর সম্পত্তি আমার দেশের'--৬৮

স্বামীর ল্যাবরেটরির সংরক্ষণ পরিচালনার মধ্যে দিয়ে সোহিনী সমাজ ও দেশের কল্যাণে ব্রতী এক নারী হয়ে উঠেছে এইভাবে। 'সায়ান্স পড়ুয়া ছেলেদের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামীবই, নানা মাইক্রোসকোপের স্লাইড্স,নানা বায়োলজির নমুনা। প্রত্যেক সামগ্রীর সঙ্গে নাম ও ঠিকানালেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জন্য চেক লেখা হয়েছে এক বৎসরের বৃত্তির । খরচের জন্য কিছু মাত্র সংকোচ করা হয়নি'।--৬৯ ল্যাবরেটরিকে ঘিরে সোহিনীর এই কর্মতৎপরতা, তার দক্ষতা,উদারতার পরিচয়বাহী। ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করতে সে নিজের মেয়েকেও ক্ষমা করেনি, ছুরির ব্যবহার প্রয়োজনে অনিবার্য হয়ে উঠবে-কন্যাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এমনকি ডঃ রেবতীর সনাতনী মনস্কতার পরিচয়ও সে কৌশলে আবিষ্কার করেছে,তার হাত থেকে ল্যাবরেটরিকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছে। সুকৌশলী ব্যক্তিত্বময়ী,শিক্ষিতা, সোহিনীর সমস্ত কর্মতৎপরতার মধ্যে সেই অভয়বাণীই পথ দেখিয়েছে: 'যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মাববনা। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব জিতবই। জিতবই, জিতবই'।--৭০ সমগ্র গল্পগুচ্ছের মধ্যে সম্ভবত 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নন্দকিশোর -সোহিনী-একমাত্র যুগল, সেখানে বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস আর ব্যক্তিত্বের সম্মিলন নারী-পুরুষ যুগপৎ উভয়কেই স্বতন্ত্র করেছে। *গল্পগুচ্ছের* নারী এবং পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করবার মতন যুগল যোগ্যতা একমাত্র এই দম্পতির মধ্যেই দেখা যায়। *গল্পগুচ্ছের* অসংখ্য নারী ও পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সোহিনী-নন্দকিশোর যুগপৎ 'স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল; জীবনময় ও রূপময়।'--৭১

৮.

গল্পগুচ্ছের অসংখ্য নারী-পুরুষের মধ্যে কতিপয় চরিত্র সৃজনশীলতার লালন ও চর্চা করেছে। সৃজনশীলতা বলতে সৃজনশীল বৃত্তি বিশেষত সাহিত্য-শিল্পকলার চর্চাকেই এখানে বোঝানো হয়েছে। এ সৃজনশীলতা কখনও পরিবেশ ও অবস্থাভেদে নারী-পুরুষকে সম্পর্কিত করেছে, আবার কখনোবা তা নারী-পুরুষের সহজাত। 'জয় -পরাজয়' (১৮৯২) গল্পে অমরাপুরের রাজসভাকবি শেখর পদাবলি রচয়িতা।

Dhaka University Institutional Repository

রাজকন্যা অপরাজিতাকে ঘিরে তার কাব্যচর্চা আবর্তিত। 'আপন মনের মাধুরী' মিশ্রিত সৃজনশীল এ কবি প্রতিভা অন্ত:পুরের নির্জনতায় লালিত, চর্চিত। দিগ্‌বিজয়ী পন্ডিত পুন্ডরীকের কাছে তার কবি-প্রতিভার দ্যুতি নিতান্তই ম্লান বলে প্রমাণিত হলে সে বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ। কাব্যচর্চার রোমান্টিক চেতনা উৎসারিত বোধে মৃত্যুর মধ্যে সে অন্বেষণ করেছে পরম প্রাপ্তি।

'খাতা' (১৮৯৩) গল্পের উমা বোধকরি *গল্পগুচ্ছের* প্রথম নারী চরিত্র, যে সৃজনশীল। বলাবাহুল্য, সৃষ্টিশীলতা নারীর প্রকৃতিগত। সে অর্থে নারী জননী, জন্মভূমি, ধরিত্রীমাতার সমার্থক। কিন্তু বোধি এবং মেধার যুগল মিলনে যে সাহিত্য-কলার সৃষ্টি, উমার ছিল তাতে সহজাত অধিকার। 'খাতা' গল্পের উমা সাত বৎসর বয়সেই দাদার দেয়া খাতায় যখন লিখেছিল 'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল' ৭২ -- তখন থেকেই তার অন্ধকার মনের আকাশেও সাহিত্য সৃষ্টির রসবোধ ঊষালোকের প্রথম আলোর মতো সঞ্চারিত হয়েছিল। লিখতে শেখার পর থেকে বাড়ীর প্রত্যেক দেয়ালে, বালিশের নীচে লুকানো হরিদাসের 'গুপ্তকথা'র প্রতিটি পাতা, নতুন পঞ্জিকা এমনকি দাদা গোবিন্দলালের প্রবন্ধ পর্যন্ত তার প্রাথমিক সাহিত্য-চর্চার শিকার থেকে রক্ষা পায়নি। এসব কিছুর মধ্যে দিয়েই তার মন সাহিত্যানুরাগী হয়ে ওঠে। দাদার দেয়া খাতাকে অবলম্বন করে তার সে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নয় বৎসর বয়সে বে-রসিক প্যারিমোহনের সাথে বিয়ের কারণে তার সমস্ত আয়োজন, সব সাহিত্যানুরাগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। শ্বশুরালয়ের ঘরকন্নার ব্যস্ততার মধ্যে এই একরত্তি খাতা তার কাছে 'বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ' ৭৩ -এর মতো। উমার একান্ত ব্যক্তিগত এ খাতা তার মনের সহজ, সরল ভাবকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবার একমাত্র স্থল। কেবল তাই নয় এ খাতাকে অবলম্বন করেই শ্বশুরালয়ের অবরুদ্ধময়তার মধ্যে থেকে তার মুক্তিকামিতা প্রকাশ পেয়েছে। শরৎকালের সকালে বোষ্টমীর আগমনী গান ঃ 'তোর হারা তারা এলো ওই'৭৪ তার সৃজনশীল চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্যারীমোহন এবং ননদিনীদের উপহাস, রূঢ়তার কাছে তার সে চেতনা লাঞ্ছিত হয়েছে, খাতাটিও হয়েছে অপহৃত। এ খাতাকে অবলম্বন করে তার সৃজনশীলতা তাকে মুক্তিকামিতার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখব 'স্ত্রীরপত্র' (১৯১৪) গল্পের মৃণালের মধ্যে। বালিকা উমার ক্ষুদ্র সৃজনশীল চেতনা *গল্পগুচ্ছের* নারী মুক্তির সূতিকাগার বলা যায়।

'মানভঞ্জন' (১৮৯৫) এর ষোড়শী গিরিবালা নাট্যকর্মী, অসাধারণ রূপবতী। 'গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্যাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গের চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে। এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে।৭৫-- এমন সৌন্দর্য নিয়েও স্বামী গোপীনাথ শীলের মন পায়নি সে। কেননা পিতার মৃত্যুতে অল্পবয়সে সংসারের কতৃর্ত্ব তাকে বিপথগামী করেছে। গান্ধর্ব থিয়েটারের নাট্যকর্মী লবঙ্গ-এর সাথে প্রণয় গোপীনাথকে স্ত্রী-বিমুখ করেছে। স্বামীর এ ঔদ্ধত্যের জবাব সে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই দেবে স্থির করেছে। নাট্যচর্চা তথা শিল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

অনির্বচনীয় আনন্দ এবং মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ সম্ভব- এ পরম সত্যটি সে উপলব্ধি করেছে গোপনে 'মানভঞ্জন' অপেরার অভিনয় দেখতে এসে। 'সেই সঙ্গীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায় এবং সম্মিলিত প্রশংসাধবনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজসংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল-মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোন বাধামাত্র নাই।'৭৬-- স্বামীর অপমান ও ঔদাসীন্যের জবাব দিতে গিয়ে গিরিবালা অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বাধীন শিল্পচর্চাই তাকে নির্ভীকতায় উত্তীর্ণ করেছে। এই নির্ভীকতা তাকে প্রাচীর-বেষ্টিত স্বামীগৃহ থেকে মুক্ত করে বহিরাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। মানুষের প্রশংসা, ভালোবাসা তাকে তৃপ্ত করেছে, শিল্পচর্চার গুণেই সে লাভ করেছে আত্মপরিচয়। এটিই গিরিবালার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

উনিশ নম্বরের বিধবা প্রতিবেশিনীকে আশ্রয়করে দুই বন্ধুর কবি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে 'প্রতিবেশিনী' গল্পে। কবিতা রচনা, বিধবা বিবাহ প্রচলন সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই বন্ধুনবীনমাধব কৌশলে বিধবা রমণীর ভালোবাসা পেয়েছে, তাকে জীবন সাথী করতে পেরেছে। কিন্তু তাদের এ সাহিত্য প্রতিভা কারোরই সহজাত নয়। সেদিক থেকে অমল-চারুলতার সাহিত্য প্রতিভায় স্বকীয়তা আছে। অমলের সাহিত্য রচনার আদলকে আশ্রয় করে চারুলতার আপন সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হয়েছে ধীরে ধীরে। লেখাপড়ায় চারুলতার স্বাভাবিক ঝোঁক চারুর সৃজনীশক্তির পক্ষে ছিল অনুকূল। সাহিত্যানুরাগের কারণেই চারুলতা অমলকে ইংরেজী সাহিত্যগ্রন্থ ক্রয়ের খরচ বহন করেছে। ভূপতির অন্তঃপুরের পতিত বাগানকে কেন্দ্র করে নিঃসঙ্গ চারু অমলের কাছে গল্প লেখার অবতারণা করেছে। অমলের 'আমার খাতা' প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনাই তার সাহিত্য রচনার প্রথম প্রেরণা- 'সে খানিকটা বুঝিয়া, খানিকটা না বুঝিয়া অনেকটা কল্পনা করিয়া,অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনের মধ্যে কী একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।' ৭৭-- এই কল্পনা- -শক্তি আগ্রহই চারুর মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির উৎস। এ প্রসঙ্গে অমলের লেখার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করবার যে অধ্যবসায়, প্রয়াস চারুলতা করেছে, সেখানেই চারুর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নিহিত। কেননা সৃজনশীল প্রতিভা চারুকে করে তুলেছে অধিকতর সংবেদনশীল। অন্তর্জাগতিক সংবেদনশীলতাই তাকে অচরিতার্তজনিত নৈঃসঙ্গ্য, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতেন করে তোলে। আর এ সচেতনতার মধ্যে দিয়েই চারু জেগে ওঠে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তায়, ভূপতির প্রত্যাবর্তন আর অমলের প্রত্যাগমনে যে ব্যক্তিসত্তার পরিচয় আরও সুস্পষ্টভাবে পাই। চারুও তার চিত্তজাগরণে অমলের অনিবার্য ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে অকপটে: 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব'।৭৮-----বস্তুত অমল-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা চারুর ব্যক্তি-হৃদয়কে বেদনাবিধুর করে তুলেছে। ভূপতির সান্ত্বনা -সংস্পর্শ সে বেদনাকে আরও প্রগাঢ় আরও 'নীল' করে তোলে। অব্যক্ত এ অন্তর্জ্বালাকে হৃদয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ধারণ করে চারু হয়েছে 'নীলকণ্ঠ'। সৃজনীশক্তির সংবেদনশীলতায়, ব্যক্তিজাগরণের স্বাতন্ত্র্যে,নৈঃসঙ্গ্য পীড়নের যন্ত্রণাকে ধারণ করবার ক্ষমতায় যার বহিপ্রকাশ:

> ''এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে----অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্তই সহজ লোকের মতো,তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকার্য সম্পন্ন করিতে হইতেছে'।৭৯----

চারুলতার সৃজনশীলতার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরসূরি, *গল্পেগুচ্ছে*, বলা যায় মৃণাল। সৃষ্টিশীলতার প্রেরণাই যার মধ্যে আত্মমুক্তির পিপাসাকে জাগিয়ে তুলেছে। বিধাতার অসর্তকতাবশতঃপ্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা আর অপার সৌন্দর্য নিয়ে মৃণাল কোলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির পাঁচিল ঘেরা বাড়ীর বধু। স্বামীগৃহে মৃণালের সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিমত্তার কদর বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ফলে মেধা-শাসিত মৃণালের সাথে অনিবার্যভাবেই স্বামীর অন্তরঙ্গতার দূরত্ব বাড়তে থাকে, দেখা দেয় দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা। মৃণাল যে সৃজনশীল এক প্রতিভা, সে যে কবি, তা দীর্ঘ পনের বছরেও স্বামীগৃহে কারো কাছে ধরা পড়েনি। 'আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম।সে ছাইপাঁশ যাই হোক সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি, সেই খানে আমি আমি । আমার মধ্যে যা--কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি; চিনতে ও পারনি; আমি যে কবি এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি'।৮০

দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার একাকিত্ব, নৈঃসঙ্গ্য থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে চারুলতার মতো মৃণালও তার সৃজনীশক্তিকে অবলম্বন করেছে। কবিতা সৃষ্টির মধ্যেই মৃণাল অন্বেষণ করেছে সাংসারিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ব্যক্তিত্বময় স্বকীয়তা----নারী মুক্তির চেতনায় যার পরিপূর্ণতা। কবি--হৃদয়ের সংবেদনশীলতা মৃণালকে বিন্দুর বেদনায় সমব্যাথী করে তুলেছে। প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বিন্দুর এবং নিজের সুখ-দুঃখকে একীকরণের ঔদার্য মৃণালের কবিসত্তার গুণেই সম্ভবপর হয়েছে। তার পত্রাংশ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: ''তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি একছটাক নেই। উত্তর দিকে পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোন গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি টক্‌ টকে হয়ে উঠেছে, সেই দিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে, আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে-- সে কোন্‌ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসেনা'।৮১

বিন্দুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মৃণালের যেন মুক্তিকামিতার মধ্যে নতুন করে অভিষেক হলো। সংসারে মেয়ে মানুষের অবস্থান, পরিচয় বিন্দুই যেন মৃণালের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের জীবন নিতান্তই মূল্যহীন, ক্ষুদ্র। কিন্তু মৃত্যু বিন্দুর পার্থিব পরিচয় মুছে দিয়ে তাকে করে তুলেছে

Dhaka University Institutional Repository

সার্বজনীন-মৃণালের সংবেদনশীল কাব্যময় উক্তি: ''তোমরাই যে ইচ্ছামত আপন দস্তর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান-সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়,কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত''।৮২

মৃণালের নিভৃতচারিনী কবি-স্বভাব এবং মেধা শাসিত নির্ভীকতা তাকে পুরুষ-শাসিত সমাজে আপোসহীন করে তুলেছিল। শ্রীক্ষেত্রের তীর্থে সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে নারী জীবনের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে গভীর বেদনায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত: ''আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ'। ৮৩ সমুদ্রের বিশালতার সামনে দাঁড়িয়ে নিছক পার্থিব জীবন, নারী জীবনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সে যে' 'নবলব্ধ প্রত্যেয়ে'।----৮৪ উপনীত হয়, সেটিও তার অতিরোমান্টিক কবি স্বভাবজাত বলেই মনে হয়। পত্রের শেষাংশ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য:

> 'তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি-ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়ে মানুষ ছিল- তার শিকলও তো কমভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্য মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু তাতে তার যা হবার তা হোক।
>
> এই লেগে থাকাই তো--বেঁচে থাকা।
>
> আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম'।৮৫----

------বিন্দুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মৃণাল বেঁচে থাকার মন্ত্র উপলব্ধি করেছে। স্বামীগৃহ ছেড়ে বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়েছে 'এই লেগে থাকাইতো বেঁচে থাকা'। নিরন্তর 'লেগে থাকা'র প্রেরণাই তাকে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করে মৃণালের সৃজনী প্রতিভার মূল্যায়ন করা যাক:

'পত্রের এই উপসংহার-অংশে এসে মৃণাল মৃত্যুচিন্তার সরণি-ধরে এক অধ্যাত্মময় দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কবি বলেই সম্ভবত তার পক্ষে এ-রকম উচ্চ দার্শনিকতামন্ডিত চেতনাস্তরে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। ---- বেঁচে থাকার মধ্যেই সন্ধান করেছে জীবনের 'জয়পতাকা'। ৮৬

৯.

নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের ওঠা-নামার ক্ষেত্রে প্রকৃতির আছে এক অলক্ষ্য ভূমিকা; *গল্পগুচ্ছে* তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে। ঔপনিষদিক প্রজ্ঞানে আত্মস্থ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে কেবল গল্পের পরিবেশ নির্মাণ কিংবা কথাবস্তুর মুগ্ধ বর্ণনার বিষয় করে তোলেন নি। তাঁর গল্পে প্রকৃতির রূপ কখনো রোমান্টিকতা থেকে মিস্টিকতায় রূপান্তরিত, আবার কখনোবা প্রগাঢ় বেদনাময় সঙ্কেতের বিপরীতে প্রশান্তিময় সত্যের প্রতীকে সংস্থাপিত। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে জীবনের চলমানতার ঔপনিষদিক উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্থিতি লাভ করেছিল আমৃত্যু।

Dhaka University Institutional Repository

২। কুষ্টিয়ার শিলাইদহ- সংলগ্ন পদ্মার বুকে ভ্রাম্যমান রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বাংলার প্রকৃতির রূপ থেকে রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছেন গভীর ভাবে। 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা'(১৮৯৬), 'কল্পনা'(১৯০০),'গল্পগুচ্ছ' (১৮৯৪), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর এ প্রকৃতি-অনুভবের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ''----------বাংলাদেশের নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নতুনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নতুনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে, অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তা বলতে পারিনে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন, সে ধারা বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। আমি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি,বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মূষলধারা বর্ষণে, পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের ছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছাচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা''।৮৭

গল্পগুচ্ছে নর-নারীর সম্পর্কের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর যোগাযোগ রয়েছে। চরিত্রের বহির্জগত এবং অন্তর্জাগতিক উদ্বোধনে প্রকৃতি কখনো প্রতীক-রূপকধর্মী, কখনো ব্যঞ্জনাময়। এছাড়াও কাহিনীর অগ্রগামিতা, ঘটনা সংঘটন কিংবা গল্পের সৃষ্টির পরিবেশ নির্মাণে প্রাকৃতিক পটভূমির গুরুত্ব বিশাল। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:

> ''মানুষের ব্যথা-বেদনা, আনন্দ প্রাকৃতিক পটভূমিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর গল্পে। মানুষের সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার সাক্ষী হয়ে প্রকৃতি অসাধরণ রূপ নিয়েছে তার রোদ বৃষ্টি -গোধূলি ও ভোরের আলো নিয়ে, কিংবা বন্য রূপের মেজাজী স্বভাব নিয়ে। এবং এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নিহিত কৌশলগুলিকে নিশ্চয় উসকে দিয়েছেন তুর্গেনিভ। গল্পগুচ্ছের পোস্টমাস্টার, ত্যাগ, একরাত্রি,গুপ্তধন, সুভা ,মাল্যদান বা মেঘ ও রৌদ্র গল্প যেভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে শীর্ষ মুহূর্তে বা মানসিক সংকটে প্রতীকী করে তুলেছে তার সঙ্গে তুর্গেনিভের দি সিঙ্গারস্ ভিশনস্ -এ

Dhaka University Institutional Repository

ফ্যানটাসি, দি রাঁদেভ্যু কিংবা টরেন্টস্ অব দ্য স্প্রিং-এর মতো গল্পের যথোচিত তুলনা চলে। --- উনিশ শতকের (১৮৯১-১৯০০) গল্পে প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ পটভূমিতে,নারী-পুরুষের অন্তরাবেগ,অন্তর্বেদনা, সংরাগের তারতম্যে প্রতিস্থাপিত, ব্যঞ্জনাধর্মী। পোস্টমাস্টার মহামায়া, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘও রৌদ্র, নিশীথে, দৃষ্টিদান প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতি চরিত্রের আবেগ সংবেদনা নিয়ন্ত্রন করেছে, উন্মুক্ত করেছে কিংবা হয়ে উঠেছে পরিণতির ইঙ্গিতবাহী।"৮৮

'মহামায়া' গল্পে চরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যাক :

''একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ করিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মাক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কিনা বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে-বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে, রাজীব কী ভাবিল জানিনা কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহমায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল''।৮৯

-----এখানে প্রথম থেকে শেষ বাক্য পর্যন্ত প্রকৃতির সম্মোহনী ক্ষমতা উদ্বোধন এবং নিয়ন্ত্রণ-পরিচর্যা রাজীবকে মহামায়ার দিকে আকৃষ্ট করেছে। কাহিনীও হয়ে উঠেছে গতিশীল । কোনো এক প্রলয়ঙ্করী ঝোড়ো প্রকৃতির মধ্যে মহামায়া রাজীবের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল। আবার, প্রকৃতির স্নিগ্ধ মোহময়তার মধ্যেই মহামায়া রাজীবকে ত্যাগ করেছে।

গ্রামীণ পটভূমিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক রূপায়িত বলে উনিশ শতকীয় গল্পের চরিত্রসমূহ অধিকাংশই আবেগতাড়িত, সহজ সরল। উনিশ শতকের নায়িকারা অধিকাংশই স্বল্পবয়স্ক, স্বল্পশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত। সে কারণে প্রেমে- অপ্রেমে, বিরহে-যন্ত্রণায় বেদনায় তাদের অধিকাংশই নীরব। প্রতিবাদ - প্রতিরোধের ভাষাও তাই নিঃশব্দ প্রকৃতি পরিচর্যায় অভিব্যঞ্জিত। 'কঙ্কাল', গল্পের কনকচাঁপা,ডাক্তার শশিশেখর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মঅবমাননার করতে গিয়ে হত্যা এবং আত্মহত্যার পথে নীরব আত্মবিসর্জন দিয়েছে। সে মুহূর্তের প্রাকৃতিক পরিচর্যা :

''বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুট ফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেলী ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

> বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘরদুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম''। ৯০

প্রাক-সবুজপত্র যুগের গল্পে (নষ্টনীড়) গ্রামীণ পটভূমি ছেড়ে চরিত্র ক্রমশ: শাহারিক পরিবৃত্তে বিকশিত হয়েছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের টানা পোড়নের সাথে সাথে প্রকৃতিও এখানে সীমিত ,অবরুদ্ধ। গ্রামীণ সমগ্র প্রকৃতি শাহরিক পরিবেশে এসে হয়েছে খন্ডিত বিচ্ছিন্ন। চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার ভাঙনের সাথে প্রকৃতিও এপর্বে হয়ে উঠেছে অধিকতর তাৎপর্যময় :

> ''সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জুঁই ফুলের গন্ধ আসিতেছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জানালার কাছে অন্ধাকারে বসিয়া আছে, মৃদু বাতাসে আস্তে আস্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝর্ ঝর্ করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছেনা''।৯১

বিশ শতকের গল্পে দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা এবং নিঃসঙ্গ চরিত্রের সাথে সাথে প্রকৃতিও হয়েছে নিঃসঙ্গ। আবার নারী মুক্তির পথ ধরে নারীর অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সাথে প্রকৃতিও অস্তিত্বকামী, সংগ্রামশীল। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের মুক্তিকামিতা প্রকৃতি পরিচর্যায় হয়ে ওঠে অধিকতর প্রতীকী, রূপময় :

> ''তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকে পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাব গাছ জন্মেছে। যে দিন দেখতুম সেই গাবেব গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেই দিন জানতুম , ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে''।৯২

১০

গল্পগুচ্ছের প্রান্ত পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর স্থিত, প্রাজ্ঞ। এপর্বে চরিত্রসমূহ অধিকতর পরিণত, সচেতন। প্রথম সমরোত্তর কাল পরিসরে দাঁড়িয়ে চরিত্র হয়ে উঠেছে ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক। এ পর্বে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিও দর্শন বিজড়িত:

বস্তুত প্রকৃতির একটি অন্তর্নিহিত আকর্ষণ আছে যা মানব মনের উপর অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে চলে অবিরত। আর মানবজীবনও প্রকৃতির নিয়মেই বিন্যস্ত সঞ্চরণশীল। 'প্রকৃতি অনুধ্যানে রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এবং স্বতন্ত্র এ কারণে যে, যুগপৎভাবে তিনি বহুবর্ণিল রূপজগৎকে প্রণাম করেছেন, আবার মহা--অরূপকে অন্তর্দাহক শান্ততায় ধ্যান করেছেন। তিনি উপনিষদ ঐতিহ্যানুসারে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতিজগতকে 'উপলব্ধি' করেছেন। আর ইয়োরোপীয় স্বভাব অনুসারে নিসর্গলোককে 'উপভোগ' করেছেন। একথা রবীন্দ্র সাহিত্যের যাত্রামুহূর্ত থেকেই সত্য''।৯৩

----সমালোচকের এ মন্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির স্বরূপ, দর্শন উন্মোচিত। মানব জীবনের উৎস, বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং পরিণতি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে।

> ''মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন, তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে----- সে নিটোল, সে সুডৌল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো ভেতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর।''৯৪

১১

দেশ কালের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলমান থেকেছে মানুষ এবং মনুষ্য সৃষ্ট সভ্যতাকে কেন্দ্র করে। নারী -পুরুষের যুগল কর্মতৎপরতায় যে সমাজের সৃষ্টি, সেই সমাজই রবীন্দ্রনাথের কাছে হয়ে ওঠে পরমার্থ, সকল বোধ ও বোধির আধার। মানুষের সুখ-দুঃখময় জীবন, রবীন্দ্র সংবেদনশীলতায় বার বার উঠে এসেছে। রবীন্দ্র-সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ, পরিণতি প্রাপ্তির সাথে সাথে মানুষের জীবনের বহির্বাস্তবতা, অন্তর্বাস্তবতার ক্রম রূপান্তর প্রক্রিয়াটিও রবীন্দ্র-সমীক্ষায় শিল্পময়,বাঙময় হয়ে উঠেছে। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'।৯৫--- এই বোধ রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে মানুষের প্রতি। সাহিত্য রচনার প্রারম্ভকাল থেকেই মানুষের জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহ, পরম বিশ্বাস,আর নির্মল ভালোবাসায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। ছোটগল্পের মতো তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ,সঙ্গীত, চিত্রকলা সকল ক্ষেত্রেই তাঁর প্রথম এবং প্রধান উপাদান মানুষ-জীবন,সমাজ, সভ্যতার মধ্যে যার পরিব্যাপ্তি। *গল্পগুচ্ছও* এ সূত্রের বাইরে নয়। নারী-পুরুষের সম্মিলিত মানব জীবনের আনন্দ-বেদনা-সমস্যা-যন্ত্রণা এবং হৃদয়-উৎসারিত কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভা হয়ে উঠেছে চলমান, পরীক্ষাপ্রিয় এবং স্থিতধী। ''রেনেসাঁসের নব-মানববাদী জীবনচেতনা নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব-অভীপ্সাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল, কিন্তু উনিশ শতকের কলোনিগহবরে বর্ধমান মধ্যবিত্তমানসে নারী-অস্তিত্বের এই স্বীকৃতি ছিল দ্বিধান্বিত। ভারতবর্ষীয় নারীর মাতৃ-আর্কিটাইপের প্রতি নির্দ্বন্দ্ব আস্থা সত্ত্বেও সমাজকাঠামোর আধুনিকায়নের গতিশীলতার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর সম্পর্ক অনুধাবন করেছেন।''৯৬ রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল জীবনে, মননে-চিন্তনে নারীর স্থান একটি বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত। *গুল্পগুচ্ছে* রবীন্দ্র-দৃষ্টি নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল। রোমান্টিক সংবেদনায় নারীর ক্রম বিকাশ, রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ রোমান্টিক এবং অভিজ্ঞানলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গির যুগলমিলন, বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত উনিশ শতকীয় সময়, সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর মূল্য তাঁর সংবেদনশীল মনে দাগ কেটেছিল। সেই সাথে ব্যক্তি জীবনেও নারীর সংস্পর্শ, প্রভাব তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে সমগ্র জীবনবোধে, সাহিত্য সাধনায় নারী অধিষ্ঠিত হয় এক স্থায়ী আসনে। *গল্পগুচ্ছে* নর-নারী সম্পর্কের রূপায়ণে রবীন্দ্র-সমর্থন, সহমর্মিতা তাই মূলত নারীকে কেন্দ্র করে । অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে দু একটি ক্ষেত্রে। নিশীথে, নষ্টনীড়, হালদারগোষ্ঠী, রবিবার, ল্যাবরেটরি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

ব্যক্তিজীবন, পাশ্চাত্য সভ্যতার মঙ্গলবোধ এবং ভারতীয় সভ্যতার কল্যাণময় চেতনার সম্মিলনে রবীন্দ্র-চেতনায় সৃজিত হয়েছিল এক বিশেষ নারী মডেল। *গল্পগুচ্ছের* তিন পর্বের ক্রমবিকাশে সেই নারী-চেতনার রূপটিই ক্রম উন্মোচিত হয়েছে। 'তিনসঙ্গী'র বিভা, অচিরা, সোহিনীতে যার পূর্ণ প্রকাশ। বস্তুত, *গল্পগুচ্ছের* নর- নারী সম্পর্কের বিশ্লেষণ মূল্যায়ণের মধ্যে দিয়েই বিন্যাস্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চেতনাগুচ্ছ ও জীবন দর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় পর্ব) কলিকাতা ১৯৬১, পৃ: ৩২৫-৩২৬

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, রবীন্দ্র- রচনাবলী-(প্রথম খণ্ড), ১২৫তম রবীন্দ্র-জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪০২, পৃ: ৮২১-৮২২

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে (পত্র), সমাজ (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠখণ্ড, ১২৫ রবীন্দ্র-জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ, সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২, পৃ. ৬৭৯

৪. ভীষ্মদেব চৌধুরী, আন্দন্দী-মৃণাল-অনিলা: সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনবিংশ খণ্ড, জুন, ২০০১-পৃ.১

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা,১৪০৬, পৃ.৬৫, ৬৭

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪১

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩- ৫৫৪

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চোখের বালি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয়খণ্ড, পূর্বোক্ত, বিশ্বভারতী, কলিকাতা পৃ. ৫০৯

৯. রবীন্দ্রনাথঠাকুর, চতুরঙ্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড,পূবোক্ত, পৃ. ৪৪০

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫০

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরে-বাইরে, পূবোক্ত পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৫৯০

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষের কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী পূর্বোক্ত পঞ্চমখণ্ড পৃ. ৪৯১

১৪. রবীন্দ্রঠাকুর, শেষের কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চমখণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ. ৫২২

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মায়ার খেলা, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৬৮২

১৬. পূর্বোক্ত, পূজা পর্যায়, গানসংখ্যা ৩৭,পৃ. ২১

১৭. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ছোটগল্পের বিশ্বপট ও রবীন্দ্রনাথের গল্প, রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কোলকাতা ১৪০০, পৃ. ৮৮

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, গ্রন্থপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ৮৪৭, ৮৪৮-৮৪৯, ৮৪৯, ৮৫১

১৯. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১৯৪১, কলিকাতা, পৃ. ৩৪৭

২০. বুদ্ধদেব বসু, অবতরণিকা, রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য,নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১৯৫৫, কলিকাতা, পৃ. ১৭

২১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, আনন্দী-মৃণাল-অনিলা: সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৪, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

২২. বুদ্ধদেব বসু, অবতরণিকা, রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২০, পৃ. ১৫

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ২০৩

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৪, ৬১৬

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৪

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৫

২৯. ভীষ্মদেব চৌধুরী, আনন্দী-মৃণাল-অনিলা: সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৪, পৃ. ৬

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ৬২৫

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হিন্দু বিবাহ', সমাজ (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৬৬৫, ৬৭০-৬৭১-৬৭২

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ১৪৭

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯১

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৬

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১২

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী,দ্বাদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩ পৃ. ৬২৩-৬২৪

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ১৮

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫ পৃ. ১৮২

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত,পাদটীকা নং ১৮ পৃ. ২১৮

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

৫৯ ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্রগল্প: অন্যরবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়, কোলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৯১

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গলপগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ৬০৮

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৪

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৬

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৬

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৬

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৬

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০০

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০১

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১০

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১১

৭১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, আনন্দী-মৃণাল-অনিলা: সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান.
পূর্বোক্ত, পদটীকা নং ৪, পৃ. ১

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পগুচ্ছ পূর্বোক্ত,পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ১৮২

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৯

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৮

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫-৫৭৬

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৬

৮৪. ভীষ্মদেব চৌধুরী, আনন্দী-মৃণাল-অনিলা; সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং৪ পৃ. ১০

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ৫৭৬

৮৬. ভীষ্মদেব চৌধুরী, আনন্দী-মৃণাল-অনিলা: সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৪, পৃ. ১১

৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনারতরীর সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫, ৬

৮৮. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ছোটগল্পের বিশ্বপট ও রবীন্দ্রনাথের গল্প রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ১৭ পৃ. ১৩০

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ১১৬

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১

৯৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, গল্পগুচ্ছে নিসর্গ: রূপ-রূপান্তর, প্রসঙ্গঃ বাংলাকথা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯০, পৃ. ২১

৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ৭৫১

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভ্যতার সংকট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত পদাটীকা নং ২, পৃ. ৭৪৪

৯৬. রফিক উল্লাহ খান, রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব, অনন্যা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক (১৮৯১-১৯০০)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল বৈচিত্র্যমণ্ডিত রচনাবলির প্রকাশ করেছেন তাঁর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতায়। নর-নারীর বিচিত্র সম্পর্ক বিশেষত নর-নারী সম্পর্কের রূপ এবং তার রূপান্তর প্রক্রিয়া চিত্রনে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। নর-নারীর মানসিক গঠন ও তার বিকাশ,মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মনোবিকলন এবং মনোজৈবনিক বিশ্লেষণ *গল্পগুচ্ছের* কেন্দ্রীয় বিষয়। এক্ষেত্রে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীর চিত্র অঙ্কণ করেছেন তিনি। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন প্রান্ত। এ চিত্র *গল্পগুচ্ছের* বিভিন্ন পর্যায়ে এসে বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। বালিকা রতন থেকে মৃন্ময়ীর যে নারীসত্তায় উত্তরণ, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞানে, জীবনদর্শনে সেই নারীই রূপান্তরিত হয় মহামায়া, চন্দরা সত্তায়। যার পরিণতি মৃণাল কিংবা সোহিনীর ব্যক্তিসত্তায় উত্তরণে নিহিত। আবার একথাও স্বীকার্য যে, নারীর এই বিচিত্র রূপ থেকে রূপান্তরের পেছনে পুরুষের রয়েছে এক অনিবার্য ভূমিকা যা এই নারী চরিত্রগুলোকে রূপান্তরে তথা বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। এ পর্বের গল্পসমূহ মূলত পল্লীকেন্দ্রীক। সে কারণে পল্লীর নদ-নদী, প্রকৃতি,পরিবেশ চরিত্রের সঙ্গে গভীর ভাবে একাত্ম। নারী, পুরুষের হৃদয়-রহস্যের উন্মোচন প্রাকৃতিক উপাদানের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ আবেগী -পরিচর্যা ও সঙ্গীতিক মূর্ছনায় গল্পের বিষয়শৈলি নির্মাণ করেছেন। আর নারী-পুরুষের এই পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তরালে ফল্গুস্রোতের মতো বহমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সমাজ- সংগঠন। পুঁজিবাদী সমাজের প্রারম্ভকাল থেকেই নারী- পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে দেখা দেয় ব্যক্তিসত্তার জাগরণ। যা একদিকে অনিবার্যভাবে সৃষ্টি করে সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। অন্যদিকে তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মহিমায় উদ্ভাসিত। মূলত 'শিল্পবিপ্লবের ফলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ফলে, মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার শ্রম থেকে,তার বিশ্রাম থেকে, নিজের গোষ্ঠী থেকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাতিস্বিক সত্তা থেকে, তার প্রেম আর অনুরাগের অনুভূতি থেকে। যন্ত্রকে নিজের সেবায় ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে যন্ত্রের দাস, মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক।১ বস্তুত সমাজের মৌলকাঠামো এবং উপরিকাঠামোর অন্তর্বিরোধ অনিবার্যভাবে সৃষ্টি করে নর-নারী সম্পর্কের অন্তর্বিরোধ। নারী-পুরুষের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের চিত্র *গল্পগুচ্ছের* বিভিন্ন গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যা কখনো নর-নারীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে অসীম ব্যবধান,কখনো বা আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ব্যক্তি আবার কখনোবা বাইরের জগতের অসঙ্গতি এবং অন্তর্জগতের জটিলতাকে পেছনে ফেলে নর এবং নারী দীক্ষিত হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরম মন্ত্রে।

দেনা-পাওনা

গল্পগুচ্ছে নর-নারী সম্পর্ক আলোচনা সূত্রে প্রথমেই ''দেনা-পাওনা' (১৮৯১) গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। পণপ্রথার যাতাকলে পিষ্ট পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থানগত মূল্যায়ন, তার বঞ্চিত জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপ এবং এই অমানবিক, দুঃসহ জীবনের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ প্রভৃতি এ গল্পের প্রতিপাদ্য যা এ গল্পের নর-নারী সম্পর্কের স্বরূপকে স্পষ্টকরে তোলে।

রামসুন্দর মিত্রের আদরের কন্যা নিরুপমা।' মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান;'২-- করে বের করেছেন জামাতা হিসেবে। বনেদী ঘর বলে পণের পরিমাণও বনেদী--দশ হাজার টাকা এবং বহুল দানসামগ্রী। দরিদ্র রামসুন্দরের সাধ আছে, সাধ্য নেই।তথাপি রাজী হলেন বিয়েতে। বিয়ের আসরে যখন বিয়ে প্রায় স্থগিত হবার উপক্রম তখন কোলকাতার নব্য শিক্ষিত যুবক, নিরুপমার বর 'সহসা পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, 'কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝিনা; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব'।৩--- যৌতুকের ছয়-সাত হাজার টাকা বাকী রাখবার বিষময় ফল যা হল তা হচ্ছে, 'নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে,তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে'।-৪ এইভাবে পণের দাঁড়িপাল্লায় নিরুপমা হয়ে যায় পণ্য বিশেষ এবং পণ্যে শ্বশুরবাড়ির অধিকার পুরোমাত্রায়। স্নেহবৎসল পিতা সেখানে বেহাইবাড়ির করুণাভিক্ষার পাত্রস্বরূপ। 'কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময় বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকেনা'।৫-- এহেন অবস্থায় শ্বশুর বাড়ীতে নিরুপমার অবস্থান কি তা সহজেই অনুমেয়। ক্রমে শ্বশুরালয় যেন তার কাছে 'শরশয্যা'৬--হয়ে উঠল। তথাপি সে পিতাকে নিষেধ করেছে বাড়ি বিক্রি করে পণের টাকা পরিশোধ করতে । তার আত্মমর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। টাকা যাদের কাছে মানুষ মূল্যায়নের মাপকাঠি তাদের বিরুদ্ধে তার বিবেক বিমুখ হয়েছে। আত্মসম্মাবোধ তাকে পীড়িত করে তুলেছে। তাই সে পিতাকে বলে, 'তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এটাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না'।৭---

কিন্তু নিরুপমা শ্বশুরালয়ে কারো সঙ্গে এই পণ সম্পর্কে কোন তর্ক বা প্রতিবাদ করেনি।সে আদ্যাপান্ত ঘটনা এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আচরণ,মানসিকতা প্রত্যক্ষ করেছে নীরবে। সরব, প্রতিবাদী বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি কখনো। তবে এই পণের কারণে পিতা কীভাবে স্বর্বস্ব হারিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করেছে। অতঃপর মেয়ে হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে নিজের মূল্যায়ণ করতে সক্ষম হয়েছে। পরিণামে শ্বশুরালয়ের রক্তচক্ষুর খড়্গে সে আত্মবলিদান করেছে বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে সজাগ রেখেছে সতত। স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অন্যত্র কর্মরত থাকায় নিরুপমার জীবনে তার ভূমিকা তেমন উলেখযোগ্য নয়। লেখক সমাজ-সমস্যামূলক এ গল্পে পণপ্রথাকে,তীক্ষ্ণ তীর্যক ব্যঙ্গ করেছেন। মনোরমার মৃত্যু এবং সৎকার সমারোহকে রবীন্দ্রনাথ কৌশলে রায়চৌধুরীদের লোকবিখ্যাত 'প্রতিমা-বিসর্জনের সমারোহ'৮-- এর সাথে তুলনা করেছেন। 'নারীঘাতী এই সামাজিক বিধিকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন এবং গল্পের শেষ বাক্যে ব্যঙ্গের তীরকে উদ্যত রেখেছেন'।৯--- পণের টাকা শোধ না হলে নিরুপমার ওপর

Dhaka University Institutional Repository

নেমে আসবে অমানবিক নির্যাতন- এটি জেনেও সে তার পিতাকে টাকা শোধ করতে দেয়নি- অন্যায়ের সাথে আপোস না করবার এই যে সাহস- এটিই তার ব্যক্তিত্বকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

পোস্ট্‌মাস্টার

গল্পটির রচনাকাল ১৮৯১ যখন কোলকাতার বাঙালি যুবসম্প্রদায় নব্যশিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে চাকুরিতে যোগদান করে যথার্থ অর্থে নাগরিক জীবনের সূচনা করেছে। এ গল্পের পোস্ট্‌মাস্টারও তেমনি নব্যশিক্ষিত এক যুবক যিনি উলাপুর গ্রামে প্রথম কাজ নিয়ে আসেন। কোলকাতার এই তরুণ ভদ্রসন্তানের এখানে এসে যে অবস্থা হয় তা 'জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে যে রকম হয়'১০ ঠিক সে রূপ। এইরূপ নিঃসঙ্গ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে পোস্ট্‌মাস্টারের সময় কাটে বারো তেরো বছরের বালিকা গৃহপরিচারিকা রতনকে নিয়ে। 'আচ্ছা রতন তোর মাকে মনে পড়ে', 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব' প্রভৃতি প্রীতিপূর্ণ কথাগুলি যে পোস্ট্‌মাস্টারের সময় কাটানোর স্বার্থে সেটি বোঝা যায়'।১১--তবে রতন পোস্ট্‌মাস্টারকে সে যেসঙ্গ দিয়েছে, অসুস্থ অবস্থায় যে শুশ্রূষা করেছে তা নিঃস্বার্থভাবে করেছে। পোস্ট্‌মাস্টার কর্তৃক 'রতনকে কাছে টানার মধ্যে যেমন কোনো দুরবগাহ চিত্তকূট নেই, তেমনি ফেলে যাবার মধ্যেও কোনো অমানবিক নিষ্ঠুরতা নেই'।১২-- বস্তুত পোস্ট্‌মাস্টার এবং রতনের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত স্বাভাবিক, বাস্তবের কঠিন রূপের বহিঃপ্রকাশমাত্র। সেকারণেই গল্পটি এত মর্মস্পর্শী । অসহায় রতনের নিরবলম্ব হবার মধ্যে দিয়ে যে দর্শনের অবতারণা হয়েছে,তা বাস্তবের কঠিন সত্যময় রূপ। তা পোস্ট্‌মাস্টারের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, ছিন্নমূল বালিকা রতনের ক্ষেত্রেও তেমনিসত্য।

সুনিপুণভাবে গৃহকর্ম সমাধা করবার জন্য অসুস্থ অবস্থায় সেবা-শুশ্রূষার পারিশ্রমিক হিসেবে উলাপুর গ্রাম ছেড়ে যাবার প্রাক্‌কালে রতনকে পোস্ট্‌মাস্টার কিছু টাকা দিয়ে বলেন, 'এতে তোর দিন কয়েক চলবে'।১৩---রতন যখন পোস্ট্‌মাস্টার কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে, তখন সে আর বালিকা নয়,নারী সত্তায় উত্তীর্ণ। কেননা রতন পোস্ট্‌মাস্টারের সঙ্গে তাদের বাড়ী যেতে চাইলে তার জবাব মেলে: 'সে কি করে হবে'।১৪-- পোস্ট্‌মাস্টারের এই সহাস্য উত্তর রতন বালিকা-হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেনি। নারী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে। সে কারণেই এ জবাব তার কাছে কেবল সান্ত্বনা নয়,মনে হয়েছে অপমান, উপেক্ষা। গল্পে তার প্রমাণ মিলবে :

'সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্ট্‌মাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল- 'সে কি করে হবে'।১৫-করুণা এবং দয়া মিশ্রিত হৃদয়ে পোস্ট্‌মাস্টার রতনকে যখন বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

'রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করিবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না' ১৬-তখন রতনের মানসিক অবস্থার বর্ণনা : 'কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই মুহূর্তে নরম কথা সহিতে পারিলনা'। ১৭--

বস্তুত ঃ 'দাদা বাবু যে বাস্তবে বাবুই, দাদা নয়-সেকথা বালিকার অবুঝ হৃদয়ে স্থান পায়নি'। ১৮--- যে অকৃত্রিম সারল্য নিয়ে রতন পোস্ট্মাস্টারের শুশ্রূষা করেছে এ প্রসঙ্গে তা স্মর্তব্য :

> 'এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'হাঁগো দাদা বাবু, একটু খানি ভালোবোধ হচ্ছে কি'।--- ১৯

বালিকা থেকে নারীসত্তায় উত্তরণের এই চিত্রের পাশে পোস্ট্মাস্টারের সহাস্য উপেক্ষা, করুণা মিশ্রিত হৃদয়ে কিছু অর্থ প্রদান আপতদৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতা হলেও এটিই বাস্তবের রূঢ় সত্য।'পৃথিবীতে কে কাহার'এই তত্ত্বে বিশ্বাসী পোস্ট্মাস্টার খুব সহজেই রতনকে ছেড়ে চলে যেতে পেরেছে এবং এ প্রত্যাখ্যানের পেছনে সক্রিয় থেকেছে পোস্ট্মাস্টারের শিক্ষা ও সমাজবোধ।

একরাত্রি

'একরাত্রি' (১৮৯২) গল্পের নায়ক মাট্সিনি গারিবালডি হয়ে দেশ সেবার মহান ব্রতকে যে মুহূর্তে গ্রহণ করেছে সে মুহূর্তে শৈশবের খেলার সাথী সুরবালাকে তার তুচ্ছ, সুলভ মনে হয় । সুরবালার সাথে বিয়ের প্রস্তাবকে তাই সে করে উপেক্ষা। এখানে বলে নেয়া ভালো, প্রথম থেকেই সুরবালার সাথে নায়কের সম্পর্ক ছিল উপেক্ষার,অবহেলার। গল্পেই তার প্রমাণ আছে :

> 'আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র'।২০

গল্পের শুরুতে সুরবালার সাথে নায়কের সম্পর্ক যেমন উপেক্ষার, গল্পের মাঝামাঝি এসে সে সম্পর্ক তেমনি রূপান্তরিত হয় প্রেমময়তায়, আবেগময়তায়। এনট্রেন্স্ পাশ করা যুবকের কাছে যে সুরবালা ছিল সহজলভ্য, সেই সুরবালাই দুর্লভ হয়ে ওঠে উকিল রামলোচনবাবুরসাথে বিয়ের পরে। নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট শহরে এনট্রেন্স্ স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার তখন নিঃসঙ্গ, দেশ সেবায় ক্লান্ত,জীবনযুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

পীড়িত।মূলত নব্যশিক্ষিত তৎকালীন যুবসম্প্রদায়ের যে মানসচারিত্র্য, তাই প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পের নায়কের মধ্যে। দুর্বল মানসতার কারণেই সুরবালাকে অবলীলায় প্রত্যাখান করে সে এবং যে মুহূর্ত থেকে সমাজ এবং সংসারের সংগ্রামশীলতায় ব্যর্থ হয় সে, সে মুহূর্ত থেকেই সুরবালার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে সে। তার এই ব্যক্তি চরিত্রের কথা সে নিজেই স্বীকার করেছে :

> 'আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে লেজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক ,মাটি ভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যা -বেলায় এক পেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, লম্ফে ঝম্পে আর উৎসাহ থাকেনা'। ২১

----এই হলো 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের ব্যক্তিচরিত্রের স্বরূপ। দুর্বল ব্যক্তিচরিত্রের কারণেই সুরবালার সাথে তৈরী হয় তার সম্পর্কহীনতা, এবং এই মরে যাওয়া সম্পর্ক ক্রমেই তার কাছে হয়ে ওঠে বেদনাময় এবং প্রচ্ছন্নভাবে তা খানিকটা কাঙ্ক্ষিতও বটে। সুরবালার প্রতি আকর্ষণের কারণেই তার স্বামীর বাড়ী যাওয়া এবং 'অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুং টাং,কাপড়ের একটুখানি খসখস এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনে' তার মনে হলো সহসা 'হৃৎপিন্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল, এবং বিশ্বাস বেদনায় ভিতরটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল'২২-- সরলতায় ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখের স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টি ক্রমেই যেন তাকে করে তোলে অনুতপ্ত, একলা। অবশেষে জীবনের ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়ে নিজের কাছেই নিজে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, 'আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা'।২৩

বস্তুত, একটি বায়বীয় আদর্শবাদের পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত বিরক্ত, গল্প-কথক তার হতাশ চিত্তের যন্ত্রণাকে যে ভাবে প্রকাশ করেছে, তা সমকালীন যুবসম্প্রদায়ের অস্থিরতা, আত্মবিশ্বাসহীনতার এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

সুভা

'সুভা'(১৮৯২) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা শারীরিক ত্রুটিমুক্ত নয়। নাম সুভাষিণী -হলেও সে ছিল ভাষাহীন, বোবা। এই ভাষাহীনতা সংসারের সকল মানুষের সাথে তার সম্পর্ক নির্মাণে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সে হয়েছে নিঃসম্পর্কিত, নিঃসঙ্গ। বোবা হবার কারণে 'সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন'।২৪

গোসাইদের অকর্মণ্য ছেলে প্রতাপ ছাড়া প্রকৃতিই তার একমাত্র সঙ্গী।

সুভার মুখে কথা ছিল না বটে , তবে তার যে সম্পদটি মুখের কথার চেয়েও বেশি কথা ব্যক্ত করতে সক্ষম সেটি তার সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ। যেখানে 'মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

উঠে,কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্যভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর-অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি।২৫

সংবেদনশীল মন নিয়ে একাকিনী সুভা যখন সবার কাছে নিগৃহীত, তখন একজনকে সে তার সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে যাকে ঘিরে সুভার মন কল্পনার রঙে রঙিন হয়েছে, সে হলো প্রতাপ-গোঁসাইদের অকর্মণ্য ছোট ছেলে। সুভা তার জন্য রোজ পান সাজিয়ে এনেছে। সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে প্রতাপের কোন কাজে সাহায্য করতে। কিন্তু তার করবার কিছু ছিলনা। তাই সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করেছে। সুভার মনের গহনে প্রতাপ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিল। সুভার সেই আশ্চর্য ক্ষমতার আভাস দিয়েছেন লেখক।

> 'মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত, আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাঝধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে-কে বসিয়া?-আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু---আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা'।২৬

----প্রতাপের সঙ্গে সম্পর্ক ভাবনায় রূপকথার এই অবতারণা শেষ পর্যন্ত রূপকথাই থেকে গেছে। সংসারের রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে কল্পনা থেকে তার চিরপরিচিত সরল গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব থেকে উন্মূলিত হয়েছে সে, নীত হয়েছে কোলকাতা শহরে। সুভা যে বোবা -এ সংবাদটি গোপন করে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোষ না করেও সমস্ত শাস্তি তাকেই মাথা পেতে নিতে হয়েছে। প্রতারণা না করেও স্বামীর কাছে সে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বোবা হবার দোষে তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে এবং এবারে 'চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা'২৭-- বধু হিসেবে নির্বাচন করেছে। গল্পের শেষে লেখকের বিদ্রূপ-বাণটি তীক্ষ্ণ থেকেছে বটে, কিন্তু সে বিদ্রূপের অন্তরালে বিধৃত একটি বোবা অথচ সহজ, সরল, রোমান্টিক মনের মেয়ের সংসার থেকে নিঃসম্পর্কিত হবার ইতিহাস। শারীরিক ত্রুটি তার সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

মহামায়া

ব্যক্তিত্বহীনতার পাশাপাশি ব্যক্তিচরিত্রের পরিস্ফুটনও ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের গল্পে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে কখনো নীরব প্রতিবাদে, আবার কখনোবা সরব ভাষায়। বলা বাহুল্য ব্যক্তিত্বহীনতা যেমন নর-নারী উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে তৈরী করেছে সংযোগহীনতা, ব্যক্তিচেতনার জাগরণও তেমনি নারী-পরুষ উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছে মেরুদূর ব্যবধান। 'একরাত্রি' গল্পে নায়িকা সুরবালার কোন সংলাপ নেই। এ গল্পের কথক নায়ক স্বয়ং। নায়কের মুখেও সংলাপ খুবই সীমিত। তথাপি কথক হওয়ায় তার ব্যক্তিচরিত্রের স্বরূপ আমরা অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু সুরবালা নীরব থাকাতে তার চরিত্রের তেমন

Dhaka University Institutional Repository

একটা পরিচয় আমরা পাইনা। আবার একেবারে নীরব নয়, সামান্য কথা বলেছে নায়িকা, এমন গল্পেও প্রকাশ পেয়েছে তার 'দীপ্ত ব্যক্তিত্ব'। 'মহামায়া' গল্পে নায়ক রাজীবলোচন এবং নায়িকা মহামায়ার সংলাপ স্বল্প অথচ তার ভেতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাদের ব্যক্তিচরিত্র, উভয়ের সম্পর্কের স্বরূপ। 'এ গল্পের আত্মায় এক গম্ভীর নিস্তব্ধতা আছে'।২৮-- এ নিস্তব্ধতা চরিত্রের ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, তেমনি প্রকৃতি পরিবেশের ক্ষেত্রেও সত্য। আর এই নিস্তব্ধতাই চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। গল্পে নায়িকা মহামায়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে দিয়েই তার ব্যক্তিচরিত্রের প্রকাশ আছে:

> 'যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পুরিপূর্ণ সৌন্দর্য;যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচা সোনায় প্রতিমা- সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক'।২৯

----এ গল্পে 'মহামায়া তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে গম্ভীর ও মৌন হয়ে বিরাজ করেছে'।৩০-- আর তার ভ্রাতা ভবানীচরণের চরিত্রে প্রবল কাঠিন্য প্রকাশ পেয়েছে। রাজীবলোচনের সংলাপ অল্প হলেও তার যে ভাবোচ্ছ্বাস প্রবল এবং মহামায়াকে পাওয়ার আগ্রহ তীব্র, তা প্রকাশিত। এই ভাবোচ্ছ্বাসের কারণে মহামায়ার মৌনতাকে সে মনে মনে ভয় পেত, মহামায়াকে পাবার ব্যাপারে শঙ্কিতও ছিল। প্রথম পরিচ্ছেদে 'রাজীব তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো'।৩১-- মহামায়ার এ কথা যেন রাজীবকে কিছুটা আশ্বস্ত করল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজের চিত্র উঠে এসেছে যা গল্পের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সহমরণ প্রথার কথা এসেছে। এ বিষয়টিও মহামায়ার ব্যক্তিত্বকে টলাতে পারেনি। চিতা থেকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় উঠে এসেছে সে। রাজীবের সঙ্গে দেশান্তরী হয়েছে। তবে তার আগে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে রাজীবকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছে , 'যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খুলিবেনা, আমার মুখ দেখিবেনা-তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি'।৩২-- অতঃপর 'তৃতীয় পরিচ্ছেদটা জুড়ে একটা ভীষণ গাঢ় রঙের মৌনের অদৃশ্য পর্দা সহবাসী এই যুগল নর-নারীর মধ্যে দুর্ভেদ্য হয়ে রয়েছে। মহামায়ার মনের কথা অনুমানগম্য, কিন্তু রাজীবের বুকের উপরে তার দুঃসহ গুরুভার পাঠকদের চিত্ত পর্যন্ত প্রসারিত'।৩৩-- মহামায়া ব্যক্তি চরিত্রে ছিল অটল, অপ্রতিহত। তার একটি অহংকার ছিল, তা তার কৌলিন্য-অহংকার। প্রেম সেখানে তুচ্ছ। এগল্পে মহামায়ার যে প্রেম তা তার এই 'ব্যক্তিত্বগৌরব তথা অহমিকা বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত'। 'কৌলিন্য-সহমরণ-বিধবস্ত যুগে মহামায়া একজনকে ভালোবেসেছিল বলেই তার নারীত্ব স্বাতন্ত্র্য লাভ করেনি। হৃদয়-স্বাতন্ত্র্যের জন্যই সে প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করেছে, ভালোবাসাকে স্বীকার বা অমান্য করেছে'। ৩৪--এগল্পে প্রেমই মহমায়ার ব্যক্তিমহিমার আধার। তাই সে চিতায় দগ্ধ হয়ে যাওয়া মুখের উপর অবগুণ্ঠন টেনেছিল। কেননা একজন দগ্ধ,আশ্রয়হীন, নিরুপায় রমণীর আশ্রয়দাতারূপে রাজীবকে সে গ্রহণ করতে রাজী নয়। এটি তার কাছে মনে হয়েছে করুণা-ভিক্ষার সমান। কিন্তু রাজীব যখন তার দগ্ধ, বিকৃত মুখচ্ছবি দেখে ফেলল, তখন মহামায়ার প্রবল ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগল। এই নিরাশ্রয়, দগ্ধ,রূপহীনাকে রাজীব আশ্রয় দিয়েছে দয়া করে-

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ 'গৌরবনাশী' ভাবনা মহামায়াকে ভীষণআহত করল। তার নীরব চিরবিদায়ে তার ব্যক্তিত্বশক্তির চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটেছে এভাবেই।

এ গল্পে একদিকে মহামায়ার ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে সহমরণজাত দগ্ধীভূত চেহারা মহামায়াকে রাজীবলাচনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে। দুজনের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিচ্ছিন্নতা এবং নিঃসঙ্গতা। এইভাবে কখনো কখনো শারীরিক পঙ্গুতাও রবীন্দ্র-গল্পে নর-নারীর মধ্যে নির্মাণ করেছে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। মহামায়া এবং রাজীবের মধ্যে 'অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি ঘোমটার ব্যবধান ছিল'। কিন্তু সেই ঘোমটাই হয়ে ওঠে 'মৃত্যুর মতো চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর মতো যন্ত্রণাদায়ক'।৩৫-- এভাবেই মহামায়া এবং রাজীব একসাথে থেকেও হয়েছে সঙ্গীহীন; 'একা'। 'দৃষ্টিদান' 'সুভা' হালদারগোষ্ঠি প্রভৃতি গল্পে দেখা যাবে শারীরিক পঙ্গুতা নর-নারীর মধ্যে নির্মাণ করেছে এক চিরস্থায়ী ব্যবধান। প্রথম পর্বের গল্পের মধ্যে 'মধ্যবর্তিনী' (১৮৯৩) গল্প এই ধারার গল্প, যেখানে শারীরিক সান্নিধ্য বর্তমান রয়েছে বটে, কিন্তু 'মানসিক বিচ্ছিন্নতা'র ৩৬ আবির্ভাব ঘটে চিরদিনের জন্য।

মধ্যবর্তিনী

দাম্পত্যবিচ্ছিন্নতা মধ্যবর্তিনী গল্পের মুখ্য বিষয়। আধুনিক মানুষের দাম্পত্যসঙ্কটের চিত্র রবীন্দ্রনাথ পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর গল্প -উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন এবং শিল্পউপাদানের উৎস হিসেবে। আলোচ্য গল্পেও লক্ষ্য করা যাবে নায়িকা হরসুন্দরীর শারীরিক অক্ষমতা-অসুস্থতা এবং নায়ক নিবারণের প্রৌঢ় বয়সে বালিকা স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণবশত প্রথমাস্ত্রী হরসুন্দরীর প্রতি ছল -ছাতুরীও অবজ্ঞা করায় তাদের মধ্যে দাম্পত্যমুধরতার স্থলে নেমে এসেছে এক অলঙ্ঘনীয়,অন্তহীন বিচ্ছিন্নতা। তবে এক্ষেত্রে হরসুন্দরীর জীবন ও প্রেম সম্পর্কে একটি ফাঁপা আর্দশ ও অন্ধবিশ্বাস তার জীবনের ট্র্যাজেডি নির্মাণে তাকে প্রলুব্ধ করেছে তবে সব কিছুর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল হরসুন্দরীর এক ধরনের মানসিক আবেগ; 'আত্ম বিসর্জনের' প্রেরণা। 'স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে স্ববেগে মূর্ছিত করে তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছাস, একটা মহৎ ত্যাগ একটা বৃহৎ দুঃখের উপর যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে'।৩৭--এই প্রেরণায় প্রলুব্ধ হয়ে হরসুন্দরী জ্যোৎস্নালোকিত বসন্তের এক 'মাতাল সমীরণে'-- ৩৮ স্বামীকে বলে 'তুমি আর একটি বিবাহ করো'। তখন মোহময়তা, আবেগময়তাবশত তার মনে হয়েছে 'স্ত্রীরা হইাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে, সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য'।৩৯-- এইভাবে স্বামী নিবারণের প্রতি তার বিশ্বাস প্রবলতর হতে থাকে। 'এদিকে নিবারণ যত বারম্বার এই অনুরোধ শুনিল ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল'। ৪০-- মূলত, হরসুন্দরী এবং নিবারণের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত এখান থেকেই। শৈলবালা-নিবারণের দ্বিতীয় স্ত্রীর আগমন স্বাভাবিকভাবেই তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে করে তোলে বিপন্ন। হরসুন্দরীর প্রেম এবং প্রবল বিশ্বাসের ভিত যায় ভেঙ্গে এবং তখন সে উপলব্ধি করে 'এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। ----আজ তাহার মনে হইল জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারী জীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারীর ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্য ভান্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল'।৪১--তদুপরি শৈলবালার প্রতি নিবারণের উপেক্ষার ভান করা অথচ প্রবল আকর্ষণের ছলছাতুরী হরসুন্দরীকে দারুণভাবে মর্মাহত করে। গল্পে তার মানসিক অবস্থার বর্ণনা এরূপ:

> হঠাৎ একটি জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্র তাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল'। ৪২ এইভাবে 'একটা কঠিন বেদনাপূর্ণ অভিজ্ঞতায় হরসুন্দরীর চৈতন্যোদয় হয়েছে'।৪৩

হরসুন্দরী প্রবঞ্চিত হয়েছে বটে, কিন্তু শৈলবালার প্রতি প্রৌঢ়ত্বজনিত অতিআদর, অধিক প্রশ্রয়ের ছলচাতুরীতে নিবারণও হয়েছে আত্মনিগৃহীত। হরসুন্দরীর কাছে গহনা চাইবার প্রাক্কালে এবং শৈলবালার মৃত্যুর পর চিরপরিচিত শয়নকক্ষে তাই তাকে প্রবেশ করতে হয় 'চির অধিকারীর মতো নয়, যেন চোরের মতো৪৪-- শুধু তাই নয়,নিজের অসামর্থসত্ত্বেও শৈলবালার সাধ মেটাতে সে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে ম্যাকমোরান কোম্পানীর ক্যাশ তহবিল থেকেও টাকা চুরি করেছে। এইভাবে নিবারণ বহির্জগত এবং অন্তর্জগত উভয় ক্ষেত্রেই নিজেকে চৌর্যবৃত্তির সাথে যুক্ত করেছে। যার পরিণতিতে সে পৈতৃক বাড়ীসহ স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি হারিয়েছে। হয়েছে চাকুরিচ্যুত, নিঃস্ব,রিক্ত এবং একলা। শৈলবালা তার জীবনে একটি 'প্রবল আবর্তের মতো'৪৫ ঘুরেছে। এবং সে আবর্তে 'নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখ সৌভাগ্য এবং বসনভূষণ'৪৬-- সমস্তই বিলুপ্ত হয়েছে। তথাপি নিবারণ এবং সংসারের প্রতি শৈলবালার ছিল প্রবল অসন্তোষ। স্বার্থপরতা, সহজলভ্যতা আর প্রশ্রয় তাকে ক্রমেই করে তুলেছে সংসারবিমুখ,অভিমানী এবং স্বেচ্ছাচারী। হরসুন্দরী ও নিবারণ তাই তার কাছে হয়ে ওঠে দাসী ও চাইদা মেটানোর যন্ত্রস্বরূপ। আর সে কারণেই শৈলবালার মৃত্যুর পর নিবারণ লাভ করে মুক্তির অবাধ আনন্দ। গল্পাংশ স্মর্তব্য:

> ''নিবারণের প্রথম খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল''।৪৭

----তার এই 'মুক্তির আনন্দ' তাকে হরসুন্দরীর কাছে ফিরিয়ে এনেছে বটে, কিন্তু তার অনেক আগেই হরসুন্দরীর সাথে ঘটে গেছে তার মানস-বিচ্ছেদ। সেকারণে, নীরবে সেই পুরাতন নিয়ম-মত সেই পুরাতন শয্যায়, সেই চিরঅধিকারের মধ্যে, চোরের মতো তাকে প্রবেশ করতে হয়। সাতাশ বছরের পুরোনো এই দম্পতির মধ্যে এভাবেই 'একটি মৃত বালিকা'৪৮ অনতিক্রম্য ব্যবধান রচনা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি ✓

নারীর প্রতি পুরুষের উপেক্ষা, চরম অবমাননা, *গল্পগুচ্ছে* নর-নারী সম্পর্কের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে নারী কখনো কখনো হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী, কখনো বা প্রতিবাদী। তবে এক্ষেত্রে নর-নারী সম্পর্কের সূত্র নির্মাণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাবল্য পালন করে মুখ্য ভূমিকা। 'শাস্তি'(১৮৯৩) এধারার শ্রেষ্ঠ গল্প, যেখানে সমাজের অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা আবিষ্কার প্রথম পর্বের (১৮৯১-১৯০০) গল্পে যেমন অভিনব, তেমনি আধুনিক। 'সমাজের নিম্নস্তর থেকে চয়ন করা উপাদান দিয়ে প্রাগ্রসর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চন্দরা নামের যে নারী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ প্রায় শতবর্ষ পূর্বে নির্মাণ করেছেন, তা আজও যে কোন বাঙালী লেখকের কাছে বিস্ময়সম্ভব'। ৪৯

এ গল্পের নর-নারী সম্পর্কের স্বরূপ পূর্ববর্তী সমস্ত গল্প থেকে ভিন্নতর। পারিবারিক কলহের মধ্যে দিয়ে গল্পের সূচনা। এ কলহ দুই জা-রাধা এবং চন্দরাকে ঘিরে যেমন চিত্রিত, তেমনি দুই দম্পতি চন্দরা- ছিদাম এবং রাধা-দুখিরামকে ঘিরেও বিস্তৃত। তবে নর-নারীর সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে চন্দরা এবং ছিদামের পারস্পরিক সম্পর্কই এখানে অধিকতর প্রকট আকার ধারণ করেছে। সে আলোচনায় যাবার আগে চন্দরা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা প্রয়োজন যা এই দুই নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিরূপণে সহায়ক হবে।

চন্দরা নামক এই নারী চরিত্রটি সমকালীন সময়ের একসাহসী সৃষ্টি। কেননা সে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং স্বামী-পুরুষের অনিয়ম-অন্যায় কে সে প্রতিরোধ করতে চায়। সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে স্বামীর চরম দায়িত্বহীনতা তথা উপেক্ষার বিরুদ্ধে। এমনকি নারী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রশ্নেও সে সচেতন। 'প্রাণধর্মিতা তাকে স্বামীর সঙ্গে সমানাধিকারের প্রশ্নে সচেতন করে তোলে'। ৫০

> 'চন্দরা দেখিয়াছিল,তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমনকি দুই একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না।। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন -তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল'। ৫১

----প্রবল জীবনাগ্রহী মনস্তত্ত্বের প্রকাশ চন্দরা চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ যা তাকে অন্য নারী থেকে স্বতন্ত্র করেছে, নারী-পুরুষ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও যুক্ত করেছে ভিন্ন মাত্রা। তার এই জীবনমুখিতা যখনই পুরুষ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তখনই সে জ্বলে উঠেছে আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায়। স্বামী ছিদামকেই তাকে যতই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছে , চন্দরা যেন ততই বন্ধনহীন পাখির মতো মুক্ত আকাশে ডানা মেলতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে গল্পের উদ্ধৃতি স্মর্তব্য:

> 'চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার

Dhaka University Institutional Repository

> সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই স্বামী রাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল'। ৫২

----চন্দরাকে যখন ছিদাম তার ভ্রাতার কৃত অপরাধকে নিজ কাঁধে তুলে নিতে বলে, তখন থেকেই স্বামীর সাথে পুরোপুরি বিযুক্ত হয়ে যায় চন্দরা। স্বামীকে তার মনে হয় সর্বগ্রাসী রাক্ষস-স্বরূপ যে তার ব্যক্তি -সত্তাকে গ্রাস করতে উদ্যত।'ঠাকুর বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আরতো ভাই পাইব না'। ৫৩ বৃদ্ধ রামলোচনের কাছে ছিদামের এই উক্তিতে তার স্বার্থপরতা, স্ত্রীর প্রতি চরম অবজ্ঞা, অবমাননা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানগত মূল্যায়নের পরিচয়টিও আমরা সেইসাথে পেয়ে যাই। স্বামীর এই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে চন্দরা তাই তীব্র, কঠিন, প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী যে চন্দরা ঘাটে আসা -যাওয়ার পথের ধারে ঘোমটা ফাঁক করে চারপাশের 'দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত' দেখে নেয়, সেই চন্দরা রাক্ষসরূপী স্বামীর ব্যক্তিস্বার্থের পরিচয় পাবার সাথে সাথেই ভিন্ন সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। তার অবস্থান সম্পর্কে সে হয়ে উঠে সচেতন। 'স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে' ৫৪ তার মধ্যে। সবকিছু ছেড়ে সে যেন চলে আসে আপন-সত্তার কাছে । সমস্ত জীবনাগ্রহ সংকুচিত হয়ে কেবল একটি বন্ধনে এসে থেমে যায়। 'ফাঁসির রজ্জুকে বরণ করে নেবার বেলা চন্দরা'৫৫ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে 'সবল', ব্যক্তিত্বময়, প্রতিবাদী-

> 'চন্দরা মনেমনে স্বামীকে বলিতেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম----আমার ইহজন্মের শেষ বন্ধন তাহার সহিত'।-৫৬

----প্রতিবাদী চন্দরার এই তীব্র জ্বলে ওঠা প্রথম পর্বের (১৮৯১-১৯০০) গল্পে নর-নারী সম্পর্কের রূপায়ণে আকস্মিক। মূলত, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের স্বার্থপরতার কারণেই জীবনবঞ্চিত হয়েছে চন্দরা। প্রথম পর্বের গল্পে পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ এ গল্পেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে।

সমাপ্তি

'সমাপ্তি' গল্পের রচনাকাল ১৮৯৩ এখানে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে কোন হার্দিক টানাপোড়েন কিংবা নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা বা বিদ্রোহী প্রতিবাদী সুর উচ্চকিত নয় বরং নর-নারীর 'প্রেম সম্পর্কের মধ্যে হৃদয়-রহস্যকে উপলব্ধির চেষ্টা আছে'-৫৭ কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃন্ময়ীর মানসিক ক্রমবিকাশ এ গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। তার দুরন্ত কিশোরী-সত্তা থেকে নারীসত্তায় উত্তরণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বামী অপূর্বকৃষ্ণের ভূমিকা অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত। বলা যায়, মৃন্ময়ীর চপলা-বালিকাসুলভ রূপ 'অপূর্ব -সান্নিধ্য'লাভের পর থেকেই রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। নর-নারী সম্পর্ক এ গল্পে এক চমৎকার সরসতার সঞ্চার করেছে। 'কৈশোরের চপলা বালিকা কিভাবে ধীরে ধীরে যৌবনের 'গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণী মূর্তিতে বিকশিত হয়ে ওঠে 'সমাপ্তি' গল্প হচ্ছে তারই এক অপূর্ব রসমধুর কাহিনী'।-৫৮ এক্ষেত্রে মৃন্ময়ী চরিত্রের চারটি চিত্র আমরা উদ্ধৃত করব যেখানে তার এই মানসিক ক্রমবিকাশ সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

১। 'এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত, চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। .....মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কোকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। ..... এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারী প্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলাকরে, সেই জন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায়না'।৫৯

২। 'মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল, কিছুতেই আর মন লাগিতেছেনা। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোথায় যাইবে,কাহার সহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না। .....মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইলনা, সেখানে যে থাকিত সেহঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর একটা বাড়ি, আর একটা ঘর, আর একটা শয্যার কাছে গুণ গুণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল'।৬০

৩। 'এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। ..... সে মনে মনে বলিতে লাগিল, 'আমি তোমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলেনা কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন'।৬১

৪। 'তাহার পদ্ম, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেই পুষ্করিণী, সেই পথ, সেই তরুতল, সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বের মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষ্ণার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না'।৬২

Dhaka University Institutional Repository

----এখানে প্রথম উদ্ধৃতিতে মৃন্ময়ীর বালিকা সুলভ-আচরণ,দুরন্তপনা, সারল্য, নিষ্পাপ মুখাবয়বের চিত্র প্রকাশিত। প্রাণরসে পরিপুর্ণ এই উচ্ছল কিশোরী এত অবাধ্যতা,দুরন্তপনা সত্ত্বেও 'জীবনচঞ্চল মুখখানি'র জন্য সবার মনে সহজেই স্থান করে নিতে পারে। একারণেই পুরুষ গ্রামবাসীদের স্নেহের ছায়ায় সে 'পাগলী', গৃহিণীদের কাছে সে তার অসংযত আচরণ ও গতিবিধির কারণে শঙ্কা ও চিন্তার বস্তু। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে -মৃন্ময়ীর বাল্য থেকে যৌবনে উত্তরণের ধাপটি সুপ্রকাশিত। বিয়েরপর শ্বশুর বাড়িতে 'পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো'অবরুদ্ধ জীবন থেকে তিনদিনের জন্য মুক্তি দিয়েছিল তাকে স্বামী অপূর্বকৃষ্ণ। কুশীগঞ্জে বাবার কাছে গিয়ে স্বাধীনভাবে তিনদিনের সংসার- সংসার খেলা এবং তারপর অপূর্বর সাথে তার বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়েই ঘটে তার যৌবনে পর্দাপণের উপলব্ধি। যৌবনে উত্তরণের এই বিস্ময়- মিশ্রিত উপলব্ধি মৃন্ময়ীর কাছে প্রথম যেভাবে ধরা পড়ে , তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে, মৃন্ময়ীর সমস্ত দেহে এবং মনে যে স্নিগ্ধ নারী-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, সে কথাই অভিব্যক্ত। দৈহিক এবং মানসিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ে স্বামী-বিচ্ছেদ-কাতরা-মৃন্ময়ীর চিত্ত ক্ষোভ মিশ্রিত অভিমান, ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। মৃন্ময়ী এখানে পরিপূর্ণ এক নারী যে স্বামী-বিচ্ছেদে ব্যথিত এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত।

চতুর্থ উদ্ধৃতিতে, স্মৃতির মধ্যে বিচরণশীল নারী-মৃন্ময়ীর এক বিশেষ মানসিক অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রিয়-বিচ্ছেদে কাতর মৃন্ময়ী মিলন-পিয়াসী। স্বামীর প্রথম চুম্বন প্রার্থনা, যা তার কাছে হাস্যকর, অর্থহীন ছিল, তাই এখন তার কাছে হয়ে উঠেছে পরমকাম্য 'কাম্যবস্তু'। বলা যায়, মৃন্ময়ীর এই ক্রমবিকাশ এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর 'রাধা' চরিত্রের ক্রমবিকাশের সাথে প্রতিসম।

মৃন্ময়ী চরিত্রের ক্রমবিকাশকে এ গল্পে প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মৃন্ময়ী' নামকরণ যেমন প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত তেমনি মৃন্ময়ীর আচরণের রূপান্তর প্রক্রিয়াও প্রকৃতির সাথে সাযুজ্য পূর্ণ হয়েছে। গল্পের প্রথমেই মৃন্ময়ীর যে ছবি আমরা পাই , তা হলো নদী তীরে ইটের স্তুপের ওপরে উপবিষ্ট বালিকার উচ্চ কণ্ঠে সুমিষ্ট তরল হাস্যলহরী যা নিকটবর্তী অশথ গাছের পাখিগুলিকে সচকিত করে তোলে। অত:পর কনে দেখে ফেরার সময় নির্জন পথে উচ্চকণ্ঠে হাস্যরত মৃন্ময়ীকেদেখে অপূর্বর মনে হয়েছে যেন 'তরুপল্লবের মধ্যে হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবীর'৬৩ আর্বিভাব। আর তার হাসিকেমনে হয়েছে 'নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কনের ন্যায় চঞ্চল'। ৬৪ যদিও গ্রামের লোকের কাছে মৃন্ময়ী ছিল পাগলী, অপূর্বর মায়ের কাছে ছিল 'অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়ে' কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নব্য গ্রাজুয়েট অপূর্বকৃষ্ণ রায়ের কাছে মৃন্ময়ী ছিল ঘুমন্ত রাজকন্যা। রূপার কাঠির স্পর্শে যে অচেতন এবং সোনার কাঠির স্পর্শে জাগ্রত করে যার সাথে মালাবদল করা যায়। যৌবনে পর্দাপণের প্রাক্কালে বাল্য জীবনকে তুলনা করা হয়েছে 'গাছের পক্বপত্রের ন্যায়' বৃন্তচ্যুত অতীত জীবন বলে। 'আর একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায়' যে ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল

Dhaka University Institutional Repository

তা যেন 'প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো' । প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই উন্মুক্ত, উচ্ছল জীবন থেকে মৃন্ময়ী নীত হয়েছে স্বামীর ঘরে। এবং প্রকৃতি পরিবর্তনের মতো করেই মৃন্ময়ীর ঘটেছে হৃদয়ের পরিবর্তন। এ পরিবর্তনে অপূর্বর প্রভাব অনস্বীকার্য। স্বামীর সহানুভূতি, ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং বিচ্ছেদ মৃন্ময়ীকে ক্রমেই করে তুলেছে অপূর্ব -মুখী। এভাবে অপূর্বর সাথে মৃন্ময়ীর পারস্পরিক সম্পর্কও হয়ে উঠেছে পরমআকাঙ্ক্ষিত, প্রেমময়। শ্বশুর বাড়িতে অবরুদ্ধ জীবন থেকে মৃন্ময়ীকে মুক্ত করে বাবার কাছে নিয়ে যাবার মধ্যে দিয়েই শুরু হয় অপূর্বর প্রতি মৃন্ময়ীর নির্ভরতা,বিশ্বস্ততা। গল্পে এই নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে :

> 'মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূণ্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রাম্য পথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শ-যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল'।৬৬

এইভাবে 'গল্পের প্রথম দিকে মৃন্ময়ীর অবাধ উন্মুক্তজীবনের হাস্যকরধ্বনী-পরিপূর্ণ যে চিত্র পাওয়া যায়, তারই এক বেদনা-মধুর রূপান্তরের আয়োজন সমাপ্তি লাভ করেছে মিলন-মুহূর্তের অজস্র বাঁধ-না-মানা অশ্রু জলধারায়।' ৬৭

খাতা

খাতা (১৮৯৩) গল্পে নর-নারী সম্পর্কের মধ্যে দুটি মাত্রা পাওয়া যাবে। এক, পুরুষশাসিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে নারীর মূল্যায়ন ও অবস্থান; দুই রক্ষণশীল রূঢ় বাস্তবতার কাছে নারীর 'চিত্তমুক্তির' নিঃশব্দ উচ্চারণ। গল্পের প্রধান নারী চরিত্র উমার যে শৈশব ও কৈশোরের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যেই দেখা যাবে কীভাবে উমার মানসগঠন সম্পন্ন হয়েছে । শৈশবের কচিমনে একটি ছোট্ট খাতা প্রধান আকর্ষক বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এই বোধই উত্তরকালে উমার সংবেদনশীল নারী-হৃদয় সৃজনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এই সংবেদনশীল শিল্পী-হৃদয় নিয়ে উমা প্রথমে পিতৃগৃহে দাদার কাছে শাসিত হয়েছে, পরবর্তীতে স্বামীগৃহে ননদিনী এবং স্বামী কর্তৃক হাস্যাস্পদ, উপেক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। উমার দাদা গোবিন্দলাল এবং স্বামী প্যারীমোহন--দুজনেই খবরের কাগজের সহযোগী লেখক। এরা দুজনেই পুরুষশাসিত রক্ষণশীল সমাজের প্রতীক। উমা পিতৃগৃহে যেতে চাইলে তার প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তার দাদা, সেটাও প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়ে। এ বিষয়ে দাদার অভিমত: ''এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়'। ৬৮
স্বামীগৃহে গোপন খাতার মধ্যে মনের কথা অকপটে লিখতে গিয়ে ননদিনীদের কাছে ধরা পড়ে গেলে 'প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল নাটকের আমদানী হইবে এবং গৃহকর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে'। ৬৯
এহেন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার আবর্তে উমার সংবেদনশীল কোমল হৃদয় যদি নিমজ্জিত হয় তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেননা এই রক্ষণশীল পুরুষেরাই তখন পরিবার সমাজ বিশেষত

Dhaka University Institutional Repository

নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, পরিচালিত করেছে। এক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, নির্ভরতার বন্ধন নয় বরং শাসন এবং কৌশলের চিত্রটিই প্রধান হয়েছে। উমার স্বামী প্যারীমোহন সম্পর্কে এ গল্পে বলা হয়েছে :

> 'বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত,স্ত্রী শক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রী শক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় , যদদ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী -বিধবা হয়'।৭০

লেখক এ গল্পে এই রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গের বাণ-বিদ্ধ করেছেন শেষ পর্যন্ত। এবং উমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। উমার খাতাটি স্বামী প্যারীমোহন কর্তৃক অপহৃত হয়েছে অন্তর্হিত হয়েছে। তথাপি, ''উমার সে লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট খাতা পাঠকের চিত্তলোকে স্থান পেয়েছে। এবং তার মধ্যে দিয়ে লেখক নির্যাতিত নারীসমাজের চিত্তমুক্তির কথা অনুচ্চ অথচ অভ্রান্ত স্বরে বলেছেন''। ৭১ এ গল্পে উমার ভূমিকা নিরীহ অথচ ব্যতিক্রমী নারী হিসেবে। মনের অব্যক্ত কথাকে অকপটে প্রকাশ করতে যে বেছে নিয়েছে একটি খাতাকে যে খাতা তার কাছে ''একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ''। ৭২ তার এই 'স্বাধীনতার আস্বাদ' যখন রাহুগ্রাসের কবলে পড়েছে,বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে তখন সে তীব্র কোনো প্রতিবাদ নয়, ''খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া একান্ত অনুনয়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে'' ৭৩ চেয়েছে। যখন প্যারীমোহন খাতাটি কেড়ে নিতে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন সে দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। এই ভাবে নারীর স্বাধীনতা, নারীর মর্যাদা এ গল্পে লাঞ্ছিত হয়েছে, অবলুণ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু নারী মুক্তির সুরটিও একই সাথে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে গল্পের শেষে।

মেঘ ও রৌদ্র

অপূর্ব -মৃন্ময়ীর সরস প্রেমের মিলনাত্মক গল্পে উন্মোচিত হয়েছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা, প্রেমময়তা। প্রথম পর্বের অনেক গল্পেই নর-নারীর এ ধরনের প্রেমের সম্পর্ক দেখা যাবে। তবে অধিকাংশ গল্পেই নারী চরিত্রগুলোর প্রথম পর্যায় সূচিত হয়েছে বাল্যবয়স থেকে।রতন,সুভা, শৈলবালা,মৃন্ময়ী,গিরিবালা,চারুশশী প্রভৃতি চরিত্র এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বয়সে বালিকা হবার কারণে পুরুষ চরিত্রের সাথে এদের সম্পর্ক ঠিক তথাকথিত 'প্রেম' বলা যাবে না, তবে 'একটা গাঢ় বন্ধন'৭৪ বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৮৯৪) গল্পে এধারার চরিত্রের সন্ধান মেলে। যদিও এ গল্প উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তথাপি নর-নারীর সম্পর্ক রূপায়ণে এক ভিন্নধারার পরিচয় পাওয়া যাবে। গল্পের নায়ক শশিভূষণ 'সদ্য বিকশিত 'এম.এ.বি. এল'। নায়িকা গিরিবালার বয়স দশ, নিতান্ত বালিকা। বয়সের এই অসমতার কারণে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে গ্রামের কারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠা ছিলনা। এমনকি পাঠকের কাছেও তাদের প্রেম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন মনে উদয় হয় না। তবে গভীরভাবে দেখলে এখানে একটি মানসিক বন্ধনের সন্ধান পাওয়া যাবে। শশিভূষণের দিক থেকে এ সম্পর্কের সমর্থন চোখে পড়ে না খুব একটা (গিরিবালার শ্বশুর বাড়ি যাবার

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ছাড়া)। এর কার্যকারণ সূত্রটি শশিভূষণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত আছে । ক্ষীণদৃষ্টি, ক্ষীণস্বাস্থ্য, স্বল্পবাক, নিভৃতবাসী শশিভূষণ 'আপন বিবরের মধ্যে'৭৫ বাস করতে ভালোবাসে। ''পুঁথি পরিবেষ্টিত' 'শশিভূষণ এম.এ পাস করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও তাহার দ্বারা হইয়া উঠেনা। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে'। ৭৬ সঙ্গীহীন, একাকী এই শশিভূষণের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সঙ্গে'। গিরিবালা ছিল তার ছাত্রী। তার বড়ো বড়ো কাব্যের তর্জমার শ্রোতা এবং সমালোচক বিশেষ। শশিভূষণের কাছে 'সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু'।৭৭ এইভাবে গিরিবালা শশিভূষণের নৈঃসঙ্গ্যের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। কিন্তু গিরিবালা শশিভূষণের সাথে খেলতে খেলতে, মিশতে মিশতে কখন মনের মধ্যে শশিদাদাকে স্থান দিয়েছে সেটি ঠিক বোঝা যায়না। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'কিন্তু গিরিবালা শশিভূষণের যে সম্পর্ক গল্পের বিচিত্র উপাদানকে সংসক্ত রেখেছে তাকে প্রেম বলতে আপত্তি করবে একালের পাঠক। কারণ দশ বৎসরের মেয়ের মনে ওই ভাবটা থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য সেকালে দশ বৎসরের মেয়ের বিয়ে হত, যদিও তার জন্য 'প্রেম'-এর আবশ্যকতা ছিলনা। যৌন-চেতনাহীন হৃদয়ব্যাকুলতাকে 'প্রেম' নাম না-ই দেওয়া যাক, একটা গাঢ় বন্ধন বলে মেনে নিতেই হবে। সেকালে হয়তো এই পথ ধরেই আমাদের সংস্কারমগ্ন দেশে প্রণয় জন্ম নেবার সুযোগ পেত।৭৮

গিরিবালার অন্তরে শশিভূষণের জন্য একটি আকর্ষণ যে তৈরি হয়েছিলো তার প্রমাণ মিলবে শশিভূষণের জেল থেকে ছাড়া পাবার পরের ঘটনায়। বিয়ের পাঁচ বছর পর একদিকে দেখা যাবে বিধবা গিরিবালা শশিভূষণের সমস্ত স্মৃতিকে সযত্নে আঁকড়ে রেখেছে। এমনকি নিয়মিত শশিভূষণের খোঁজ-খবর রেখেছে এবং জেল থেকে মুক্ত হবার পর তাকে সাদরে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়ন করেছে। তার প্রতি সহমর্মিতা, সমবেদনা প্রদর্শন করেছে। আবার, যদিও গিরিবালার প্রতি শশিভূষণের কোন জৈবনিক আকর্ষণের লেশমাত্র এ গল্পে পাওয়া যায় না, তথাপি গিরিবালার শ্বশুরালয়ে যাত্রার সময় প্রকৃতির বৈপরীত্যময় চিত্রের মধ্যে দিয়ে শশিভূষণের যে চকিত মর্মবেদনার পরিচয় পাওয়া যায়, তা গিরিবালার সাথে তার মানসিক বন্ধনেরই ইঙ্গিত বহন করে:

> 'নৌকা ক্রমশ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিকঝিক্ করিতে লাগিল। নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়ানৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয় যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন!

Dhaka University Institutional Repository

''শশিদাদা!''—— কোথায় রে কোথায়। কোথাও না ! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না, তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে'। ৭৯

বস্তুত, আত্মবিশ্বাসের অভাব, অসহায়তাবোধ শশিভূষণকে 'সকর্মকসত্তার পরিবর্তে করে তুলেছে কর্মবিমুখ, ভাববিলাসী ও কল্পনাচারী'। ৮০

তাই বৈষ্ণব ভিক্ষুকদের কীর্তনে শশিভূষণ খুঁজে পায় এক সান্ত্বনার আহবান :

''এসো এসো ফিরে এসো-নাথ হে, ফিরে এসো !
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
বঁধু হে, ফিরে এসো! ৮১

এগল্পের শেষে গিরিবালা যেমন বাল্যকালের 'প্রীতিকে' প্রণয়-স্মৃতিতে রূপান্তরিত করে একটা মানস আশ্রয় তৈরী করেছিল'৮২ শশিভূষণও তেমনি নিরাভরণা, শুভ্রবসনা গিরিবালাকে তার অন্তিম শান্তি ও 'সান্ত্বনার প্রতীক'৮৩ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ গল্পে আমরা শান্ত ,নিস্তরঙ্গ স্বভাবের এক গিরিবালাকে দেখি যার প্রেম বা হৃদয়ব্যাকুলতার আভাস খুব একটা পাওয়া যায় না। সীমাবদ্ধতা বা গৎবাঁধা জীবনের মধ্যেই যার জীবন পরিসমাপ্তি। কিন্তু এই গল্পের অনতিকাল পরেই লেখা 'মানভঞ্জন'(১৮৯৫) গল্পে আমরা আরেক গিরিবালার সাক্ষাৎ পাই, যার স্বভাব, চরিত্র 'মেঘ ও রৌদ্র'(১৮৯৪) গল্পের গিরিবালা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। নামের সাযুজ্য থাকা সত্ত্বেও দু জনের স্থান,কাল পাত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ'জনের জীবনে যে দুই পুরুষের আগমন ঘটেছে, তাদের চরিত্রও সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের গল্পে এভাবে ক্রমে দেখা যাবে চরিত্রের পরিবর্তন। ক্রমে ক্রমেই স্থান কালেরও পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেই সাথে ঘটে যায় নারী-পুরুষ সম্পর্কেরও পরিবর্তন।

প্রায়শ্চিত্ত

'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'বিচারক' (১৮৯৪) গল্প দুটিতে পুরুষ কর্তৃক নারী হয়েছে প্রতারিত। নারীর ভালোবাসা, বিশ্বাস এখানে উপেক্ষিত। ব্যক্তিত্বহীনতা ও মনুষ্যেত্বের চরম অবমাননা এ গল্পদুটিকে নর-নারী সম্পর্কের রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট করেছে। পুরুষের এই প্রতারণা,লাঞ্ছনা,অবমাননার বিরুদ্ধে নারীর কোন প্রতিবাদ দেখা যায়না। বরং গল্পদ্বয়ে পুরুষের প্রবল প্রতারণা নারীর কাছে পেয়েছে প্রশ্রয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পের বিন্ধ্যবাসিনী স্বামী অনাথবন্ধুর অলসতা ও কর্মবিমুখতা সত্ত্বেও স্বামীগর্বে ছিল গর্বিত। এই গর্বের কারণেই লোকসমক্ষে বারবার সে হয়েছে ছোট, কুণ্ঠিত। শ্বশুরবাড়িতে আশ্রিত অনাথবন্ধু এক ধরনের 'ফাঁপা' অহংকারবোধের মধ্যেই ছিল তৃপ্ত। 'স্ত্রীর ভক্তি ও সেবায় শ্বশুরালয়ের রাজকীয় সম্মান-আরাম-সম্ভোগে, জ্যেষ্ঠের উপার্জনে পাড়ায় মাতব্বরি করে বেড়ানোয় তার যেন স্বতঃসিদ্ধ অধিকার।' ৮৪ তার এই মনোভাব যখনই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তখনই সে অত্যন্ত নীচ,হীনকর্ম করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। 'আজকাল বিলাতে না গেলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যায়না।৮৫--- এই মনোভাবে পুষ্ট অনাথবন্ধু বিলেতে যাবার পথ খরচা হিসেবে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করেছে, সেখানে গিয়ে স্ত্রীর গহনা বিক্রির টাকায় সে আনন্দ-

Dhaka University Institutional Repository

স্ফূর্তি করেছে এবং দেশে এসে মা কিংবা স্ত্রীর কাছে না গিয়ে হোটেলে আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ করেনি। এমনকি যে স্ত্রীকে অবলম্বন করেই তার অহংবোধের অস্তিত্ব টিকে আছে, তাকে লুকিয়ে বিলেতী মেম বিয়ে করতেও তার বিবেকে বাধেনি। এহেন স্বামীর স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী যে 'স্বামী দেবতার জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকতে পারার মধ্যেই জীবনের সবটুকু গৌরব'৮৬ বোধ করে। অবশ্য তার এই অন্ধবিশ্বাস, মধ্যযুগীয় ধারণার শাস্তিও সে ভালোভাবেই পেয়েছে। স্বামী কর্তৃক প্রতারণার শেষ যেটুকু বাকি ছিল তা উন্মোচিত হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের সমারোহের মধ্যে 'অরক্ত-কপোলা আতাম্রকুন্তলা আনীললোচনা দুগ্ধফেনশুভ্রা' ৮৭- ইংরেজ মহিলার 'দাম্পত্যের মিলন চুম্বন'-এর মধ্যে দিয়ে। বিন্ধ্যবাসিনীর সরল বিশ্বাসের মূলে এই আঘাত অনাথবন্ধুর ব্যক্তিত্বহীনতা চৌর্যবৃত্তি, কাপুরুষতাকেই প্রমাণ করে। তবে অনাথবন্ধুর এই অসংযত আচরণ এবং প্রতারণার মূলে বিন্ধ্যবাসিনীর অসচেতনতা, ব্যক্তিত্বহীনতা এবং অতিপ্রশ্রয়ই মূলত দায়ী।

বিচারক

'বিচারক' গল্পেও নারীর সরল বিশ্বাস, অতিনির্ভরতা তাকে করেছে অসহায়, নিরাশ্রিত, উন্মূলিত। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত, প্রতারিত হয় নারী, আবার সেই পুরুষই করে নারীর কলুষতার বিচার। এই পরিহাস এগল্পের মূল ভাবকে ধারণ করেছে। রবীন্দ্র-গল্পে বিচিত্র শ্রেণীর নর-নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে এ গল্পটি একটি নতুন সংযোজন বলা যায়। কেননা এ গল্পেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ একজন পতিতা-নারীর মর্মকথাকে রূপায়িত করেছেন পুরুষ চরিত্রের বিপরীতে। গল্পের প্রথম ভাগে ক্ষীরোদা নামে এক পতিতারমণীর দুঃসহ জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে। গল্পের শেষে এই পতিতার জীবনের আদ্যপান্ত পরিচয় আমরা যেভাবে পাই,তাতে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট তা হলো পুরুষের প্রতারণাই হেমশশীকে রূপান্তরিত করেছে ক্ষীরোদা--চরিত্রে। আর যে পুরুষটি তার জীবনে কালিমা লেপন করে তাকে নিক্ষেপ করেছে ক্লেদময়তার অন্ধকার গুহায়, সেই পুরুষটিই পরবর্তী জীবনে টিকিধারী জজসাহেব, যার হাতে এই পতিতার বিচারের ভার ন্যাস্ত। ফাঁসির আদেশ দেবার পর মোহিতমোহন দত্ত যখন নিজের 'যৌবনকালের চিত্রশোভিত প্রণয়োপহারটি দেখল'৮৮ তখন তার মনে হলো :

> 'তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন------ তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।
>
> মোহিত আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্নাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল'।৮৯

Dhaka University Institutional Repository

----চব্বিশ বৎসর পরে নিজের যৌবনের স্মৃতি আচমকা মনে পড়ায় জজসাহেবের মনোভাবের স্বরূপ এখানে উন্মোচিত হয়েছে। যৌবনের প্রতারণাকে উপলব্ধি করেও তার লাম্পট্যকে স্বীকার করে নিয়ে এই বারাঙ্গনা তার দেওয়া প্রণয়োপহারটিকে কীভাবে সযত্নে ধারণ করেছে, লালন করেছে তার প্রণয়স্মৃতি হিসেবে -সেকথা উপলব্ধি করে জজসাহেব ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হয়েছে বটে , কিন্তু ক্ষীরোদার এই প্রণয়স্মৃতি লালনের পশ্চাতে তার বঞ্চিত জীবনই প্রকট হয়ে উঠেছে। তারওপর 'স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার' মহিমা আরোপিত হলেও সারাজীবন সে প্রতারিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে, সেকথা বিস্মৃত হবার নয়।

'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'বিচারক' গল্পদুটিতে পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতারণার যে দুটি চিত্র পাওয়া গেল,তাতে দেখা যাবে এ প্রতারণা নারীর জীবনকে করে তুলেছে দুর্ভার,ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ পুরুষটি থেকেছে নির্বিকার। তার জীবন থেকেছে স্বাভাবিক, সচল। এমনকি এই লাম্পট্যের কারণে তার বিবেকে হয়নি কোন দংশনের জ্বালা, অনুশোচনার যন্ত্রণা। 'গল্পগুচ্ছের' কোন কোন গল্পে আমরা পুরুষের এই বিবেকের দংশনজনিত যন্ত্রণার চিত্র পাব যেখানে নারীর প্রতারণা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নায়কের জীবন হয়েছে বিপর্যস্ত,মানসিক বিকারগ্রস্ত। 'নিশীথে' 'ক্ষুধিতপাষাণ' 'মণিহারা' প্রভৃতি এ শ্রেণীর গল্প।

নিশীথে

'নিশীথে'(১৮৯৪) গল্পে নায়ক দক্ষিণাচরণবাবু রোমান্টিক ভাবালুতাবশত ভালোবাসার একই সংলাপ দুই স্ত্রীকে বলেছে এবং তারপরেই দেখা দিয়েছে তার মানস-বিকার। বলা যায়, গল্পের অধিকাংশ কাহিনী জমিদার দক্ষিণাচরণবাবুর মনোগহন থেকে উদ্ভূত। তার মানস-গঠন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার তখন বয়স বেশি ছিলনা, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্য শাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না'। ৯০ দক্ষিণাচরণবাবুর জীবনতৃষ্ণার উৎস এ অংশে প্রোথিত। চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় বকুলতলার এক মোহময় পরিবেশে প্রথমা স্ত্রীকে তিনি যে আবেগতাড়িত সংলাপ বলেন, তার বর্ণনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য :

> 'আমি ধীরে ধীরে গাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাহার একটা উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল; আমি বলিয়া উঠিলাম, ''তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলিবনা''। ৯১

বস্তুত, স্বামীর এই ভাবালুতা-তাড়িত চরিত্রের প্রতি স্ত্রীর ছিল না কোন বিশ্বাস, ছিলনা কোন নির্ভরতা। পুরুষ চরিত্রের অন্তর্লোকের প্রতি তার এই আস্থাহীনতা প্রকাশ পেয়েছে তার আচরণে; 'তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোন আবশ্যক ছিলনা। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন । সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবংকিঞ্চিত অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, 'কোনোকালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না'।৯২

Dhaka University Institutional Repository

বলাবাহুল্য, এটি কেবল দক্ষিণাচরণবাবুর প্রতি স্ত্রীর আস্থাহীনতার সংবাদই নয়, তার স্ত্রীর ব্যক্তিচেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ ও অহংসজাগতার অন্যতম উৎস। স্ত্রীর এই ধারণা মিথ্যা হয়নি। তার 'জীবদ্দশাতেই তিনি অন্য নারীকে ভালোবেসেছেন এবং স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিয়ে করেছেন'। ৯৩ তারপর থেকেই শুরু হয় তার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। অসুস্থ স্ত্রীর সেবাকরতে করতে তিনি যখন ক্লান্ত, পীড়িত তখন জৈবিক নিয়মেই স্ত্রীর চিকিৎসকের কন্যা মনোরমার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। বলা যায়, এখান থেকেই তার চিত্তবিভ্রমের শুরু:

> 'মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূল পরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছল ছল ঢল ঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না'।৯৪

ভিতর--বাইরের এই দ্বন্দ্বই দক্ষিণাচরণবাবুর সবচেয়ে বড় চিত্ত-সংকট, এই সংঙ্কটের পথ ধরেই তার জীবনে নেমে এসেছে মানস-বিকৃতির অভিশাপ। স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে মনোরমার সঙ্গে দেখা করা, অসুস্থ স্ত্রীকে মনোরমা দেখতে এলে ভীরু, কাপুরুষের মতো 'আমি চিনি না' বলা মাত্রই বিবেকের দংশনে পরমুহূর্তে 'ও' আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা'। বলে স্বীকার করা প্রভৃতি আচরণ তার দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও মানস -অসঙ্গতিরই পরিচায়ক। উত্তরকালে তিনি অকপটে তার এই অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন, 'তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলানাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ'। ৯৫--স্ত্রীর সাথে এই ছলনা করায় স্ত্রী যেমন হয়েছে আত্মঘাতী, তেমনি দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেও আস্তে আস্তে দক্ষিণাচরণবাবু নিক্ষেপিত হয়েছে নৈঃসঙ্গ্যের অতল গহবরে, মানস-বিকৃতির ফ্যাকাশে শূন্যতার মধ্যে। মনোরমাকে বিয়ে করে দক্ষিণাচরণবাবু তার জীবনের শূণ্যতাকে পুরণ করতে পারেন নি। তার প্রমাণ তার স্বীকারোক্তির মধ্যেই খুঁজে পাই ----

> 'আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব'।৯৬

---এই 'খটকা' কেবল মনোরমার মনেই লাগেনি, দক্ষিণাচরণের মনেও লেগেছিল। তাই তার মদ খাবার নেশা ক্রমেই প্রবল হতে থাকে। বলা বাহুল্য, এ 'খটকা' তাদের দুজনেরই বিবেক-উদ্ভূত। তাই 'শরতের সন্ধ্যায়' 'কৃষ্ণপক্ষের', জ্যোৎস্নায় মোহময় পরিবেশে দক্ষিণাচরণ যখন বলে, 'মনোরমা , তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলিতে পারিব না।' তখন থেকেই তার মনের নিভৃতকোণে অপরাধবোধের ছোবল প্রগাঢ় হতে থাকে। এর পরই শুরু হয় তার 'বিকারগ্রস্ত মনের অভিক্ষেপণ'।৯৭

অসুস্থ স্ত্রী যে রাত্রে কেরোসিনের বাতির আলো -আঁধারিতে মনোরমাকে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে স্বামীর হাত ধরে প্রশ্ন করেছিলো ''ওকে ওকে- তখনই দক্ষিণাচরণবাবুর হৃদয় পাপবোধে শরবিদ্ধ হয়েছিল। এই

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রণাতেই উত্তরকালে তিনি হয়েছে অবচেতনাশ্রয়ী ,বিকারগ্রস্ত। এরপর থেকেই 'হাঁস উড়ে যাওয়ার শব্দে,' 'বাতাসের মৃদুস্বরে, ঘড়ির টিক্‌টিক, আওয়াজে, এক কথায় প্রত্যেক চেনা শব্দের মধ্যে দিয়ে তার সেই প্রথমাই যেন কথা কয়ে ওঠে ওকে ওকে ওকে গো'। নিজের অপরাধবোধের গরলে আকণ্ঠ আচ্ছন্ন হয়ে অবচেতনভাবেই এই ধ্বনি তাকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তোলে। দক্ষিণাচরণবাবুর মনের গহীনে আছে প্রথমা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার অঙ্গীকার ও প্রতারণার দায়, অথচ উপরিতলে সে ক্রমশই দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি সেই একই সংলাপে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছে। এতে তার মনোজগতে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে,তাতে সে হয়েছে আদি-অন্ত-ক্ষত-বিক্ষত। সে কারণে ''মনোরমার প্রতি যখনই হৃদয় বিহ্বল হত তখনই চাবুকের মতো , বিবেকের ভৌতিক আতঙ্ক নিয়ে নিজের চিত্তগহন থেকে ঐ দুটি ধ্বনি বেরিয়ে আসত'।৯৮ দক্ষিণাচরণবাবুর জীবনে দুইজন নারী এসেছে। দুজনের কাছেই সে একইভাবে একই স্থানে, একই পরিবেশে প্রেমাসক্তির অঙ্গীকার করেছে। ফলে দুজনের কারো কাছেই সে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। উপরন্তু নিজের অপরাধবোধের দংশনে নিজেই হয়েছে নীল, যন্ত্রণাকাতর।

বস্তুত দক্ষিণাচরণবাবুর দ্বি-চারিতাপ্রীতি তাকে কীভাবে করে তুলেছে অপরাধী, ভীত, অসুস্থ সেকথা পুরো গল্প জুড়েই অকপটে সে স্বীকার করেছে।

গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্বের (১৮৯১-১৯০০) গল্পে নর-নারী সম্পর্কের রূপায়ণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ নারীকেই অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত, সহজ, সরল সমীকরণে চিহ্নিত করেছেন। পুরুষের অন্যায়ের এবং শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রতিবাদ এ পর্বের নারীরা করেনি বললেই চলে। এক্ষেত্রে নিরুপমা (দেনা-পাওনা), চন্দরা (শাস্তি) ব্যতিক্রমী চরিত্র। তবে তারা পুরুষের অন্যায় স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। এদিক থেকে ''দিদি''(১৮৯৪), 'মানভঞ্জন (১৮৯৫)' 'উদ্ধার (১৯০০)' গল্পের নারী চরিত্রে আরো দৃঢ়তা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াবার অমেয় সাহস প্রত্যক্ষ' ৯৯ করা যাবে। প্রথম পর্বের নারী-চরিত্রের মধ্যে এই সাহসের প্রাবল্য বিরল।

দিদি

নর-নারী সম্পর্কের দিক থেকে দেখলে 'দিদি' গল্পকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে আছে শশিকলা জয়গোপালের দাম্পত্যজীবন যেখানে প্রবাসী স্বামীর বিরহ-বিচ্ছেদে শশিকলার মনে হয়েছে 'এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিবনা'। ১০০ দ্বিতীয় অংশে মা, বাবার মৃত্যুর পরে তাদের সন্তান নীলমণির লালন পালনের ভার দিদি শশিকলার ওপর অর্পণ এবং স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়নের সূত্রপাত।

বস্তুত একমাত্র মেয়ের জামাতা হবার সুবাদে জয়গোপাল ছিল শ্বশুরমহাশয়ের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে যখন শশিকলার পিতা কালিপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল তখন জয়গোপালের 'সমস্ত আশা ভরসা' যেন অপহৃত হলো। মা-বাবার মৃত্যুর পর নীলমণির ভার যখন দিদি শশিকলার ওপর ন্যাস্ত হলো তখন থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে সম্পর্কের ভাঙ্গন দেখা দিল।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা, ''ভালোবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশী-অবিলম্বেই বুঝিল,জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধান আড়াল করিয়া রাখিত-স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, ,তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল'। ১০১

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত' ১০২ যখন চলছিল, তখন একদিকে শশিকলা তার ভাইটিকে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, অন্যদিকে স্বামী জয়গোপাল তার শ্যালকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়ে। শশিকলা যখন স্বামীর এই চক্রান্তের কথা জানতে পারে, বলা যায় তখনই সে আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমায় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে । দাম্পত্য জীবনের মধুময়তা তার কাছে মলিন হয়ে গেল। তার পরিবর্তে সমস্ত সংসার 'তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত, হঠাৎ দেখিল, সে একটা নিষ্ঠুর ফাঁদ তাহাদের দুটি ভাই-বোনকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক,অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল,ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল' । ১০৩

----বলা যায়, শশির এই হৃদয় বেদনাই তার স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছে।

স্বামীর অন্যায় ষড়যন্ত্রকে সে প্রশ্রয় দেয়নি বা নীরবে সহ্য করেনি। বরং স্বামীর প্রতি তার ঘৃণা,ক্রোধ এবং প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হলো। স্বামীর হিংস্রতা থেকে, ষড়যন্ত্র থেকে নাবালক ভাইকে রক্ষা করবার শেষ উপায় হিসেবে সে বেছে নিয়েছে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। প্রবল সাহস ,সততা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে সে সাহেবের কাছে স্বামীর অত্যাচার ষড়যন্ত্রের কথা অকপটে প্রকাশ করেছে জয়গোপালের উপস্থিতিতেই। নিজের জীবন বিপন্ন করে স্নেহের ভাইকে সে নিশ্চিন্তে নির্ভরতায় তুলে দিয়েছে সাহেবের হাতে। এইভাবে ভাইয়ের সাথে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হবার সাথে সাথে তার দাম্পত্য বন্ধনও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। স্বামীর সাথে আপোষ করেনি বলে শাশিকলাকে স্বামীর ক্রোধানলে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। কিন্তু ন্যায়ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি শশিকলা। পুরুষের লাম্পট্যকে ঘৃণা করেছে সে। প্রয়োজনে তাকে প্রতিরোধ করেছে কঠোর চিত্তে। ইংরেজ সাহেবের কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তাই সে কুণ্ঠিত হয়নি। এভাবেই উন্মোচিত হয়েছে শশীকলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা।

মানভঞ্জন

'দিদি' গল্পে শশীকলা স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে, প্রতিকার করেছে স্বামীর লোলুপ ষড়যন্ত্রের, কিন্তু নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন জেনেও স্বামীর ঘরকে সে প্রত্যাখ্যান করেনি, ফিরে গেছে সেই মৃত্যু ফাঁদের মধ্যে। যেখানে তাকে জীবন পর্যন্ত বির্সজন দিতে হয়েছে। কিন্তু 'মানভঞ্জন '(১৮৯৫) গল্পে দেখা যাবে,গিরিবালা স্বামীর অন্যায়, উপেক্ষা,অত্যাচারের বিরুদ্ধে কীভাবে আস্তে আস্তে প্রতিবাদী -মনস্ক হয়ে উঠেছে এবং এক পর্যায়ে স্বামী, সংসার ছেড়ে নিজের জীবনের সদর্থক অস্তিত্ব ভাবনায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অস্তিত্বকামী নারীর এই সংগ্রামশীলতা উনিশ শতকীয় সময় ও সমাজের প্রথাবদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধে এক বিপ্লবের আভাসের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে। গল্পের শুরুতে গিরিবালার সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্যেই সেকথা আভাসিত হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

> 'গিরিবালার সৌন্দর্য আকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গের চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র'। ১০৪

অপূর্ব রূপলাবণ্য নিয়ে ধনীগৃহের বধূ গিরিবালা নিঃসঙ্গভাবে সময় কাটিয়েছে। স্বামী গোপীনাথ কোলকাতার ধনী বাবু সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় লোক। 'বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ীর কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে-কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার. গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল'। ১০৫ গোপীনাথের উদাসীনতা, দায়িত্বহীনতা, অন্য নারীর প্রতি আসক্তি, স্ত্রীর হৃদয়াবেগ-ভালোবাসাকে উপেক্ষা, নির্যাতন প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্রমে গিরিবালাকে করে তুলেছে স্বামী বিমুখ,অভিমানী, জ্বালাময়ী এবং 'প্রস্তর মূর্তির মতো' ১০৬ কঠিন, প্রতিবাদী। উঁচু প্রাচীর-বেষ্টিত অভিজাত গৃহের অন্তঃপুর বাসিনী -গিরিবালার অন্তরে ছিল এক 'পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখি' যে 'অনন্ত আকাশে মেঘরাজ্যের অভিমুখে'। ১০৭ উড়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। সে কারণে অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও প্রবল প্রেম-পিয়াসী, জীবনার্থ পিপাসু গিরিবালা 'চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট করিয়া দেখিয়া লয়'। ১০৮ গোপনে থিয়েটার দেখতে এসে স্বামীর ভালোবাসা বঞ্চিত, অন্তঃপুরের কর্মহীন জীবনের সাথে বর্হিজগতের কর্মময়, সৃষ্টিশীল জীবনের পার্থক্য দেখতে পেল গিরিবালা। সে অবহেলিত,অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী-সংসারে নিজের অবস্থানগত এই মূল্যায়ণ তার ব্যক্তিত্বকে সজাগ করে তোলে, কর্মময় জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তখনই 'তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল'। ১০৯ নিজেকে সে আর 'অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র বলে ভাবতে পারল না। স্বামীর ঔদাসীন্য আর নির্যাতনকে পেছনে ফেলে কর্মময়, আনন্দময় জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে, থিয়েটারের অভিনেত্রী হিসেবে নাট্যদলে যোগ দিয়েছে সে। নারীমুক্তির প্রেরণাতেই সে স্বামীর অন্যায়, অত্যাচারকে প্রবল অবজ্ঞা করবার সাহস পেয়েছে। বধূসত্তার মধ্যেই যে জীবন সীমাবদ্ধ নয়,স্বামীর ভালোবাসা প্রাপ্তিই যে একমাত্র সুখ নয়, বরং কর্মময়তা, সৃজনশীলতার মধ্যেই যে প্রকৃত সুখ, আনন্দ নিহিত এই মূলমন্ত্র প্রথম পর্বের গল্পে গিরিবালার মধ্যেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে।

দৃষ্টিদান

প্রথম পর্বের গল্পের মধ্যে নর-নারী সম্পর্কের স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা পুরুষ এবং নারী চরিত্রের মধ্যে বিচিত্র মাত্রার সন্ধান পেয়েছি। পুরুষের স্বার্থপরতা,হীনমন্যতা ব্যক্তিত্বহীনতা কীভাবে নারীকে ক্রমশ প্রতিবাদী, সচেতন ও মুক্তিকামী করে তুলেছে, নর-নারীর পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সহমর্মিতার সেতু বন্ধনে কীভাবে নির্মাণ করেছে অদৃশ্য ফাটল, তাই প্রথম পর্বের গল্পের নর-নারীর সম্পর্ক নিরুপনের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। 'দৃষ্টিদান' (১৮১৮) গল্পটি স্বতন্ত্র। এখানে নারী -পুরুষ উভয়ে উভয়কে প্রথমে দেবতা জ্ঞানে সম্মান করতে চেয়েছে। ফলে সেখান থেকে ভালোবাসা ক্রমশ হয়েছে অন্তর্হিত। এবং দাম্পত্য সম্মিলনের পরিবর্তে নৈঃসঙ্গ্য এবং দূরত্ব দুজনের মাঝখানে হয়ে ওঠে দুরতিক্রম্য। নায়িকা কুমুর স্বগতোক্তিতে তার প্রমাণ মেলে,: 'আমাদের দু'জনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটলভাবে বিরাজ করিত'। ১১০

দেবতা জ্ঞানে সম্মানে-শ্রদ্ধায় স্বামীর 'জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকতে পারার মধ্যেই জীবনের সবটুকু গৌরব', উপলব্ধি করেছে কুমু। স্বামী অবিনাশ প্রদত্ত 'ললাটে একটি নির্মল চুম্বনের' মধ্যে দিয়ে কুমু নিজের 'দেবীত্বে অভিষেক' বলেমনে করেছে। অথচ স্বামী স্ত্রী দুজনেই পরস্পরের কাছে আন্তরিক ভালোবাসা, নির্ভরতা আকাঙ্ক্ষা করেছে। এ আকাঙ্ক্ষায় স্বামী সম্পর্কে কুমুর ভারতীয় সনাতন মূল্যবোধের পাশাপাশি আরেকটি বিষয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলো কুমুর অন্ধত্ব। যদিও এ অন্ধতার পেছনে অবিনাশের কর্তব্যকর্মে অবহেলাই মূলত দায়ী। নিজের এই অপরাধবোধ এবং স্ত্রীর স্থায়ী অন্ধত্ব তাকে ক্রমশ ক্লান্ত করেছে। মানসিক অপরাধবোধ থেকে স্ত্রীকে সে দেবীর আসনে বসিয়েছে বটে, কিন্তু ব্যক্তিক আন্তর্গরজে সে কোন দেবী নয়, অন্বেষণ করেছে একজন সামান্য রমণীকে। কুমুকে তাই সে বলেছে :

> তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারিনা। যাহাকে বকিব, ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই। ১১১

পক্ষান্তরে, কুমুও 'স্বামীর দৃষ্টিতে দেবী হয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছে-'যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারিনা, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব'। ১১২

এইভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে ।নীচের উদ্ধৃতিগুলোতে কুমু-অবিনাশের পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র লক্ষণীয় :

> ক)''তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা, এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন''। ১১৩

> খ)''কিন্তু এই যে দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুঁজিয়া পাইনা।

Dhaka University Institutional Repository

> স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়, কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া উঠে যখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই। .....কিন্তু একদিন এবিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই, অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইনা''। ১১৪

এইভাবে চোখে দেখার বিচ্ছেদের সাথে সাথে মানসিক বিচ্ছেদও তৈরী হয়ে গেছে দুজনের অজ্ঞাতসারে। এই বিচ্ছেদকে আরও আশঙ্কাময় ও বিষাদময় করে তোলে হেমাঙ্গিনী, অবিনাশের পিসিমার ভাসুরঝি। স্ত্রীর অন্ধতা ক্লান্ত অবিনাশকে দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী করে তোলে। যদিও শেষপর্যন্ত তার মোহভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করতে তাদের দুজনকেই দেবলোক থেকে নেমে আসতে হয়েছে মানবলোকে।

> 'এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।
>
> আমি হাসিয়া কহিলাম, ''না আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিণী, আমি সামান্য নারীমাত্র'।
>
> স্বামী কহিলেন, ''আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনো অপ্রতিভ করিয়োনা' ১১৫

দেবত্বের মিথ্যে খোলস বিসর্জন দিয়ে তারা উভয়েই জীবনের নতুন অর্থ নিয়ে পারস্পরিক নৈকট্য অটুট রেখেছে।দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ এবং দেবত্ব আরোপিত প্রেম নয় মানবিক প্রেমের বিজয় এ গল্পকে আধুনিকতার মাত্রা দান করেছে।

উদ্ধার

পুরুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের গল্পে আরেক নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সে 'উদ্ধার' (১৯০০) গল্পের গৌরী। গিরিবালা, গৌরী-দুই চরিত্রের নামকরণগত সাদৃশ্য থাকলেও মুক্তি পিয়াসী এই দুই নারীর মুক্তিকচেতনার মূল সুরটি ভিন্ন। এদের মধ্যে একজন সদর্থক জীবনার্থে বিশ্বাসী, কর্মের মধ্যেই মুক্তির সন্ধান করেছে, আরেকজন অস্তিত্বকামী, কিন্তু অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে অস্তিত্বকে বির্সজন দিয়েছে সে। গিরিবালার কাছে জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোন সান্ত্বনা নাই, তাই সে নাট্যশিল্পের চর্চার মধ্যে দিয়ে মুক্তির আনন্দ লাভ করেছে। আর গৌরী জীবনের হীন, নোংরা,লোলুপ দিকটি দেখে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। স্বামীর মিথ্যা সন্দেহ অপমান ও অবরুদ্ধ জীবন উৎসারিত যে বলিষ্ট বোধ ব্যক্তিত্বতাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি। সৃষ্টিশীল জীবনের আনন্দময় দিকটি তার কাছে অন্বিষ্ট হয়ে ওঠেনি। প্রবল

Dhaka University Institutional Repository

আত্মচেতনার অধিকারী হয়েও গৌরী চরিত্রটি তাই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারেনি। এ গল্পে নারীর আত্মমর্যাদার পাশাপাশি পুরুষের হীনমন্যতা, লাম্পট্য, লালায়িত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে যা একদিকে সমাজের কদর্যরূপকে উন্মোচিত করে, অন্যদিকে নারীর সম্ভাবনাকে করে ব্যাহত। গিরিবালা এবং গৌরী চরিত্র প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

গিরিবালা স্বামীর বিরুদ্ধে গিয়ে নতুন জীবনে তবু বাঁচবার ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল,স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছিল, কিন্তু গৌরী যেখানে আশ্রয় সন্ধান করেছে সেখানে গৈরিক বসনের অন্তরালে এমন এক ক্ষুধিত পশুর বাস যার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছিল। সেকালের সাধুসন্ন্যাসী অপেক্ষা এ কালের রঙ্গমঞ্চ নারীর মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে,বাঁচার ক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য-এই কথাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই দুটি গল্পকে পাশাপাশি রাখলে। গল্পের শেষে গৌরীর সতীমাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ করে সমাজকে আর একবার বিদ্রূপ করার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ ছাড়েন নি। সেকালের যে সহমরণ প্রথাকে কেন্দ্র করে নারীর সতীমাহাত্ম্য খুব ঘটা করে প্রচার করা হতো সেই সহমরণে নারী যে কতো অসহায় হয়ে তবে প্রবৃত্ত হয়েছে সেকথা আজকের দিনে অনুমান করা শক্ত নয়। গৌরীর আত্মহত্যার পেছনেও এক অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সকলে তাতে সহমরণের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে উল্লসিত হয়েছিল'। ১১৬

স্বামীর সন্দেহ-প্রবণতা থেকে গৌরীর তেজস্বিনী হয়ে ওঠার সূত্রপাত। 'উন্মত্ত সন্দেহ' ১১৭ এই দম্পতিকে করে তোলে পরস্পর বিমুখ, বিচ্ছিন্ন। নারীত্বের অপমানে গৌরী 'আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত' ১১৮হতে থাকে। 'স্বামীর স্বভাবের প্রতিক্রিয়ায় ঘৃণায় ও ব্যক্তিত্বগর্বে গৌরী বিদ্রোহ করেছিল'। ১১৯ কিন্তু যে গুরুর হাত ধরে স্বামী,সংসার পরিত্যাগ করতে চেয়েছে সে, সেই গুরুকে 'চোরের মতো পুষ্করিণীর তট্টে অপেক্ষামান দেখে বজ্রচকিতের ন্যায়' তার সম্বিত ফিরে এসেছে। 'গুরু যে কোথায় হইতে কোথা নামিয়াছেন, তাহা যেন বিদ্যুতালোকে সহসা এই মুহূর্তে তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।' ১২০ বলা যায়, স্বামীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুর আসল স্বরূপ উদঘাটন দুয়ে মিলে গৌরীর ব্যক্তিচেতনার 'অহমিকার ভিত্তি ভেঙ্গে পড়েছে'। ১২১

প্রবল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'মর্যাদা-সচেতন' ১২২ গৌরীর 'মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা' ১২৩ শেষ পর্যন্ত অংকুরেই বিনষ্ট হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. অশ্রুকুমার সিকদার, যুগলের নিঃসঙ্গতা, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৯৮ পৃ. ২১

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৪০৫, পৃ.১১

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২.

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৯. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্যরবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৮

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২ পৃ. ১৬

১১. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা, প্রথম খণ্ড, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৩ পৃ.২৭

১২. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পগুচ্ছ: অন্যরবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত,পাদটীকা নং৯, পৃ. ১৬

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৯

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯

১৮. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১, পৃ. ২৭

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২ পৃ. ১৭-১৯

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

২৮. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত,পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ২, পৃ. ১২৬

৩০. ক্ষেত্রগুপ্ত , রবীন্দ্র-গল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৫৩

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

৩৩. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৫৪

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭.

৩৫. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬

৩৬. পূর্বোক্ত পৃ.২৭

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৪০

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা,১৪০৬, গানসংখ্যা ১৪৬, পৃ. ৬৭

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত পৃ.১৪০

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

৪৩. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১, পৃ. ২০

৪৪. অশ্রুকুমার সিকদার যুগলের নিঃসঙ্গতা, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১, পৃ. ২৭

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৪৫

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৪৯. বিশ্বজিৎ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৪

৫০. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১, পৃ. ৩৪

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

৫৪. জীবনানন্দ দাশ 'বোধ' প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র, আবদুল মান্নান সৈয়দ কর্তক সংকলিত ও সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮

৫৫. আনোয়ার পাশা রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ১১, পৃ. ৩৬

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ২ পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১ পৃ. ২২

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৬৭. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ১১, পৃ. ২৩

৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৮৪

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

৭১. ক্ষেত্রগুপ্ত , রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৭৮

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৮৩

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

৭৪. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ.৮৪

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

৭৮. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ.৮৪

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

৮০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈ:সঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৪

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

৮২. ক্ষেত্রগুপ্ত রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৮৫

৮৩. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১, পৃ. ৯০

৮৪. ক্ষেত্রগুপ্ত , রবীন্দ্র-গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৮৭

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্প গুচ্ছ, পূর্বোক্ত পৃ. ২১৩

৮৬. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ১১, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ২১৭

৮৮. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৯৩

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ২, পৃ. ২২২

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

৯৩. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোট গল্প সমীক্ষা পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১, পৃ. ৫৩

৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ২২৬

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮

৯৭. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৯৮

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

৯৯. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১,পৃ. ৭৮

১০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ২, পৃ. ২৪০

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২

১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬

১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮

১১৬. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা পূর্বোক্ত , পদটীকা নং ১১, পৃ. ১১৮

১১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ২, পৃ. ৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

১১৯. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ১৪৮

১২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ৩৬৩

১২১. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ , পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ১৪৮

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক (১৯০১-১৯১৩)

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের (১৯০১-১৯১৩) গল্প বলতে প্রাক-সবুজপত্র (১৯১৪) যুগে রচিত গল্প সমূহকে নির্দেশ করা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়-পরিসরে রচিত যে স্বল্পসংখ্যক গল্পে নর-নারী সম্পর্কের চিত্র পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'নষ্টনীড়' (১৯০১) অন্যতম। 'হার্দিক রক্তক্ষরণে বিদীর্ণ চারুলতা নামের এক আধুনিক নারীর হৃদয়বেদনার গল্প 'নষ্টনীড়'১। গ্রামীণ সারল্য, অকুণ্ঠ বিশ্বাস, ভাবালুতা এবং রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে প্রথম পর্বের (১৮৯১-১৯০০) গল্পের নর-নারীর বিচিত্র সম্পর্কের স্বরূপ। 'মানভঞ্জন' (১৮৯৫) ব্যতীত অধিকাংশ গল্পের পটভূমি গ্রাম নির্ভর হওয়াতে সেখানকার পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্বহীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও কোন কোন চরিত্রে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে এবং কোলকাতা-কেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে কোন কোন গল্পে, তথাপি নর-নারী সম্পর্কের বিচারে পুরুষদের মধ্যে দেখা যাবে সামন্ত মূল্যবোধ- লালিত ধ্যান-ধারণা এবং বিকাশমান মধ্যবিত্তের দুর্বলতা। পক্ষান্তরে অধিকাংশ নারী চরিত্র গ্রাম-কেন্দ্রিক হওয়াতে গ্রামীণ সারল্য, সীমাহীন বিশ্বাসের ছবি যেমন আমরা পাই, তেমনি নারী জীবনের প্রবঞ্চনার চিত্রটিও অগোচর থাকেনা। এখানে অধিকাংশ নারী জীবনের চাওয়া-পাওয়া, অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়; সময়, সমাজ, পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের ক্রমশ সচেতন করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে (১৯০১-১৯১৩) অধিকাংশ গল্পের নর-নারী কোলকাতা নগরের অধিবাসী। এ পর্ব থেকে নারী চরিত্রসমূহ বলা যায়, নিজেদের অধিকার, চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে সচেতন এবং সনাতন মূল্যবোধকে লালন করতে চায়নি কোনমতেই। পুরুষ চরিত্রের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ করা যাবে।

প্রথম পর্বের (১৮৯১-১৯০০) নর-নারীর সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের (১৯০১-১৯১৩) নর-নারীর পার্থক্যের সূচনা নির্দেশকরণের ক্ষেত্রে বলা যায় 'নষ্টনীড়' গল্পটি প্রথম ধাপ। এক্ষেত্রে প্রথম পর্বের চরিত্রসমূহের পাশে ভূপতি এবং চারুলতাকে স্থাপন করলেই দুই পর্বের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। প্রথম পর্বের মোহময়, আবেগী পরিচর্যা পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ এ পর্বে বিশ্লেষণধর্মী পরিচর্যা গ্রহণ করেছেন। সেইসাথে তাঁর নর-নারীও কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে ক্রমশ। 'সবুজপত্র যুগের গল্প তথা বিশ্বযুদ্ধত্তোর উপন্যাস রচনার ক্রমিক প্রযুক্তির স্বাক্ষরবাহী গল্প হচ্ছে 'নষ্টনীড়'। এ গল্পে হৃদয়াবেগের চেয়ে মনোবিকলন,গতির চেয়ে বিকৃতি গীতময়তার চেয়ে বিশ্লেষণ সমধিক-এই বৈশিষ্ট্যই 'সবুজপত্র' যুগের গল্পে ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়েছে। এ বিচারে 'নষ্টনীড়' বাংলা গল্পের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি'।২

Dhaka University Institutional Repository

নষ্টনীড়

পূর্বেই বলা হয়েছে 'নষ্টনীড়' চারুলতা নামের এক আধুনিক নারীর হৃদয়বেদনার গল্প। তার এই হৃদয় বেদনা তথা হার্দিক রক্তক্ষরণের পেছনে অনিবার্যভাবে জড়িত দুই পুরুষের ভূমিকা। স্বামীভূপতি এবং দেবর অমলের সাথে সম্পর্কের সংযোগ-বিয়োজনের মধ্যে দিয়েই চারুলতা হয়েছে নিঃসঙ্গ, উন্মূলিত, একাকী। 'ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্মছিলনা। ফল পরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূণ্য দীর্ঘ দিন-রাত্রির একমাত্র কাজ ছিল'। ৩ অথচ নগরনন্দিনী চারুর ছিল লেখাপড়ার প্রতি একটি স্বাভাবিক ঝোঁক। কোনো একটা নূতন বই, নূতন লেখা নূতন খবর নূতন কৌতুক তাকে আকর্ষণ করত স্বাভাবিক ভাবেই। ধনীগৃহের অফুরন্ত অবসর এবং স্বামীভূপতির ব্যস্ততা তার এই পিয়াসী মনকে করে তুলেছে ক্রমশ তৃষিত। 'কিন্তু কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে'৪ ছিল দুরূহ। এই নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে দিয়েই বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করেছে। অপর পক্ষে, 'খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না।'৫ সৌখিনব্যস্ততা তাকে এতটাই নির্বোধ করে তুলেছিল যে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ববোধ, সঙ্গদানের প্রয়োজনীয়তা তার মনে স্থান পায়নি। বরং 'স্ত্রী সঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ সম্পাদক এইরূপ বুঝিল'।৬ সে- -কারণে সে শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়ীতে এনে নিশ্চিন্ত হয়েছে। ফলে ভূপতি এবং চারুলতা বিয়ের পর থেকেই 'নতুনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত'৭ হয়ে উঠেছে ক্রমশ। দেবর অমলের মধ্যে চারুলতা খুঁজে পেয়েছে তার রস পিপাসু মনের সঙ্গীকে। এ ক্ষেত্রে 'চারুলতা' নামকরণটি তাৎপর্যবহ । সৌন্দর্যপিপাসু মন নিয়ে লতার মতোই যেন কাউকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে সে। অমল তার সেই অবলম্বন যেখানে খুঁজে পায় সে মানসিক তৃপ্তি, আত্মিক প্রশান্তি। এভাবেই স্বামী ভূপতির সঙ্গে চারুলতার এক 'দুর্ভেদ্য দূরত্বের'৮ সৃষ্টি হয়। এবং নিজের অজান্তেই চারু এক সময় অমলের সঙ্গে মানসিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। সেকথা সে উপলব্ধি করেছে অমল বিয়ে করে বিলেত যাবার পর------

> ''নিজের অসহ্য কষ্টেও চারুলো চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'কেন। এত কষ্ট কেন হইতেছে। অমল আমার এতই কী যে তাহার জনা এত দুঃখ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। ---------- কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয়, কিন্তু দুঃখের কোনো উপশম হয়না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে কোথাও সে পালাইবার স্থান পায়না।৯

অমল বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় চারুলতা এখানে ভীত, অসহায়, কাতর। নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করেছে অবিরত। কিন্তু অমলকে সে মন থেকে অপসারণ করতে পারেনি কোনো ক্রমেই। উপরন্ত, স্বামী ভূপতির

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গও তার কাছে যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। অমল চলে যাবার পর চারুলতার বেদনাময় ঔদাসীন্য ভূপতিকে বিস্মিত এবং সংশয়ী করে তোলে। যদিও এর জন্য সে নিজেকে খানিকটা অপরাধী ভেবেছে। কিন্তু চারুলতার হৃদয়ভ্যন্তরের শোণিতপাতের স্বরূপ সে উপলব্ধি করেছে অনেক পরে। ভূপতির এই ঔদাসীন্য ও মূঢ়তার কারণে তাদের দাম্পত্য নৈকট্য যেমন হয়েছে দূরবর্তী, তেমনি এই 'দুর্ভেদ্য দূরত্বও তাদের কাছে অলঙ্ঘনীয় হয়ে উঠেছে। কেননা অমলের স্মৃতি চারুলতার কাছে পরিশেষে 'ধ্যান' ও 'গর্বের' বিষয় হয়ে উঠেছে। গৃহকার্যের অবকাশে নির্জনে ঘরের দরজা বন্ধ করে অমলকে যেন সে সাধনা করেছে, অমলের প্রতি করেছে আত্মনিবেদন 'অমল তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিন ও না, একদন্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ। আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পুজা করিব'। ১০ -এইভাবে চারুলতা অন্তরের অন্তঃস্তলে 'সাধিকা' হয়ে উঠেছে। 'বৃহৎ বিষাদের মধ্যে এক প্রকার শান্তিলাভ' ১১ করেছে এবং তার পরেই সংসার এবং স্বামীর প্রতি যত্নশীল হতে পেরেছে। অন্তরে বাইরে দুই স্থানে দুই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে চারুলতা যে পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়েছে তা যেমন নিদারুণ তেমনি মর্মান্তিক। অর্ন্তজগত এবং বহির্জগতের প্রতিনিয়ত এইদ্বন্দ্বে ক্রমশ চারু হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত,নিঃসঙ্গ, একলা। তার এই নৈঃসঙ্গ্য যন্ত্রণার চিত্রটি এখানে উল্লেখযোগ্য :

> ''এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না, তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সভিজত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়'। ১২

----উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে চারুলতার মনোজগতের যে চিত্র অঙ্কিত, তা যেমন রিক্ত, বিষন্ন তেমনি বেদনাময়। অমলের সাথে অতিবাহিত রঙিন স্বপ্নময় দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে হঠাৎ করেই যেন কল্পনার জগত ছেড়ে কঠিন বাস্তবতর মুখোমুখি হয়েছে চারুলতা। এই 'ভীষণ আবিষ্কারে' ১৩ তার চিত্তলোক হয়েছে বিদীর্ণ, দ্বন্দ্বময়। দ্বৈতসত্তা নিয়ে বহির্জগত এবং অন্তর্জগতের সাথে করে গেছে ক্রমাগত অভিনয়। অমল-বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে সযত্নে লালন করেছে সে সংগোপনে।

অমলের বিরহ-বেদনায় চারুলতা হাহাকার করে ফিরেছে, কিন্তু অমল চারুর মনের এই গোপন সংবাদটি জেনে সেখান থেকে চলে যেতে চেয়েছে। তড়িঘড়ি করে বিয়ে করেছে, দেশ ত্যাগ পর্যন্ত করেছে। সে যেন হঠাৎ করেই উপলব্ধি করে, 'পর্বত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবা মাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহবরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল'। ১৪ নিজের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে অপরাধবোধ জেগেছে বলেই অমল বিদায়কালে চারুর সঙ্গে দেখা করেনি, বিদেশে গিয়ে চারুর কোন সংবাদ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেনি, চিঠি ও লেখেনি। দাদার কাছে লেখা পত্রে কেবল প্রণাম জানিয়েছে মাত্র। তবে 'অমল চারুর কোন অভাব পূরণ করেনি, সে চারুর অভাববোধ জাগিয়েছে।। অমলের সাহচর্যে তার কল্পনাশক্তি-রচনাশক্তির প্রকাশ ঘটেছে।.....চারুর লেখাই শুধু অমলের প্রভাব ডিঙিয়ে স্বাধীন হয়ে উঠল তা-ই নয়, তার ব্যক্তিত্বের মুক্তি ঘটল ওই পথ ধরে, অমলের দেখানো পথে, অমলের সাহচর্যে'। ১৫ বস্তুত অমলের সংস্পর্শে এসেই চারুলতা অর্জন করেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তার রুচি ও মেধার বিকাশ অমলের সাহচর্যেরই অবদান যা তাকে অন্য নারী থেকে স্বতন্ত্র করেছে। অমল-বিচ্ছেদের আঘাতে চারুর হৃদয় যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ, ভূপতি তখন বহিঃ সংসারের প্রতারণার আঘাতে অন্তঃপুরবাসী চারু -মুখী হয়েছে। চারুর হৃদয় জয় করবার জন্যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে ভূপতির ধারণা এক্ষেত্রে গল্পাংশ থেকে উদ্বৃত করা যেতে পারে-------

> বোধকরি ভূপতির চেষ্টা একটা সাধারণ সংস্কার ছিল- স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে- হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখেনা। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই। ''১৬

কিন্তু চারুর ক্রম ঔদাসীন্য, নীরবতা, চিত্তদৌর্বল্য এমনকি ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করিয়া ওঠা, এ সমস্ত লক্ষণ ভূপতিকে ক্রমশ সংশয় -সংকুল করে তোলে। 'প্রি-পেড' টেলিগ্রাম পাবার পর একটি সন্দেহ ভূপতিকে ক্রমশ বিদ্ধ করেছে 'এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল - সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল'। ১৭ এখান থেকেই ভূপতি এবং চারুলতার মধ্যে সচেতনভাবেই একটি দুর্ভেদ্য দুরত্বের সৃষ্টি হলো। আধুনিক দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতাকে উভয়েই লালন করেছে। 'তাদের মধ্যে যে ছোট ছোট বাক্য বিনিময় হয়, সে তাদের বিচ্ছিন্নতারই প্রমাণ'। ১৮ এই মানস ব্যবচ্ছেদের কারণ হিসেবে কেউ কাউকে দোষারোপ করেনি।বরং ভূপতি চারুলতার যন্ত্রণাকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। 'অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রত্যহ পুঞ্জীভূত দুঃখভার' ১৯ নিয়ে চারু তার সেবা যত্ন করে চলেছে, এটি বুঝতে পেরে সে নিজেও সংকুচিত হয়েছে। সে উপলব্ধি করেছে চারুর বেদনাকে - 'এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে'।২০ তাই নিঃসম্পর্ক লোকের মতো কেবল মানসিকভাবে নয়, শারীরিকভাবেও সে দূরে যেতে চেয়েছে। 'যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে'২১ তার কাছে থেকে সে পলায়ন করতে চেয়েছে। তাই বিদায়কালে চারুলতা সঙ্গে যেতে চাইলে সে সম্মত হয়নি। কিন্তু 'মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা'২২ দেখে ভূপতি তাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছে। কিন্তু তখন চারু জবাব দিয়েছে ''না থাক্''।২৩ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই দ্বিধা তাদের দুজনকেই করেছে মেরুদূর। পারস্পরিক নৈকট্যের পরিবর্তে এই দ্বিধাই তখন হয়ে ওঠে দুঃসহ সান্নিধ্যের কন্টক। সে কন্টকে

Dhaka University Institutional Repository

কেবল চারুলতা নয়, ভূপতিও হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। ভূপতির মনোভাবনার স্বরূপ ধরা পড়েছে এভাবে-----

> ''যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা , সে আমি কতদিন পারিব। আরও কত বৎসর আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে। যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেছে তাহার ভাঙ্গা ইটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিবনা, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে'?২৪

এই দুর্ভার সান্নিধ্য থেকে দুজনেই মুক্তি খুঁজেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'দুজনের হ্যাঁ-তে না-তে মেলেনা'। ২৫ দুজনের সংশয়, দোদুল্যমানতা এক অমীমাংসিত এবং অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। সে দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায় না দু জনের কেউ।

প্রতিবেশিনী

নর-নারী সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'প্রতিবেশিনী' গল্পের সাথে প্রথম পর্বের 'দৃষ্টিদান' (১৮১৮) গল্পের বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও এটি একটি প্রেমধর্মী গল্প এবং 'তাতে রোমান্টিক কমেডির মেজাজ'২৬ আছে তথাপি তাকে ছাপিয়ে যে বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে তা হলো মানবিক প্রেমের বিষয়। 'দৃষ্টিদান' গল্পের মতো এখানে নারী-পুরুষ উভয়কে দেবত্বের আসনে বসায়নি। এক বিধবা রমণীকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর প্রেমাবেগ দুই পথে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের একজনের পথ জীবনমুখী,অন্যজনের পথ আদর্শমুখী।

'জ্যোতির্বিদ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে'২৭ তাকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে গল্প-কথক তার পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনীর দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কিন্তু তার সে দৃষ্টি এবং মনের গভীরতম আবেগটি ছিল নির্মল এবং গোপন। কেননা, প্রতিবেশিনী ছিল বিধবা। তাই তাকে দেখে নায়কের মনে হয়েছে, 'শরতের শিশিরাপ্লুত শেফালির মতো বৃন্তচ্যুত'২৮ বাসর গৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নয়। সে কেবল দেবপূজার জন্য উৎসর্গীকৃত। তার ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে সুদূর প্রসারিত নিবিড় বেদনা ও ব্যাকুলতাকে প্রত্যক্ষ করেও নিজের মনের উষ্ণ আবেগকে সুস্থির রেখেছে।

সমাজ-সংস্কারের আদর্শবাদকে তুলে ধরতে সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করছে বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সৎসাহস নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভীরুতা তাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সে কারণেই মনে মনে তাকে পুজা করেছে, এজন্য সে গর্ব অনুভব করেছে। নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণকে সে আদর্শায়িত করে কাব্য কল্পনার বস্তু করে রাখতে চেয়েছে, তাকে দেবীর দূরত্বে নির্বাসিত রেখে আত্মপ্রতারণা করেছে। যদিও সে তার অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে হৃদয়ের উষ্ণ নিঃশ্বাসের প্রবাহ কোন 'স্বর্গের দিকে নহে, মানবহৃদয়নীড়ের দিকে'২৯ তথাপি প্রতিবেশিনীকে সে কল্পনা করেছে 'কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিনী' ৩০

Dhaka University Institutional Repository

রূপে এবং সে অকপটে তার আত্মসংযমের কথা স্বীকার করেছে: তার 'সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত' ৩১ হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমের উত্তাপকে অবদমিত করে আত্ম বঞ্চনা করেছে গল্প কথক। তার এ আত্মবঞ্চনার পশ্চাতে সমকালীন যুগমানস, দ্বিধা দ্বন্দ্ব ব্যক্তিত্বহীনতা ক্রিয়াশীল, যা তার হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে পক্ষান্তরে, বন্ধু নবীনমাধব কোন নির্দিষ্ট আদর্শবাদকে আঁকড়ে ধরেনি। তার কাছে জীবনের স্বাভাবিক গতিময়তাই সত্য। অন্তরের সহজ স্বাভাবিক চাওয়াকে বাস্তবায়ন করতে নির্দ্বিধায় সে আদর্শবাদের সংস্করণ করতে প্রস্তুত। কেবল তাই নয়, প্রেমকে সার্থক করে তুলতে সে কিছু কৌশলেরও আশ্রয় নিয়েছে যা তাকে এনে দিয়েছে প্রাপ্তি যে নারীকে সে আশ্রয় করে তার প্রেম মুকুলিত হয়েছে তার বৈধব্য নবীনের কাছে বড় হয়ে ওঠেনি বরং তার বৈধব্যকে ছাপিয়ে মানবিক প্রেমের বিজয়টিই উর্ধ্বে উঠে গেছে। এ ক্ষেত্রে প্রেয়সীর সাথে সম্পর্ক নির্মাণে তার ব্যক্তিত্ব অধিকতর জীবনমুখী, সাহসিক এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা মুখী। গল্প-কথকের মধ্যে যে প্রেমের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, 'তা দেহকে ছাড়িয়ে পূজোর স্তরে উপনীত হয়েছে'৩২ শুধু তাই নয় তার স্বভাবগত কুণ্ঠা ও ভিরুতা নায়িকার কাছে কখনোই আসতে দেয়নি। কিন্তু নবীনমাধবের প্রেম জীবনমুখী। প্রেম এবং জীবন সম্পর্কে কোন স্থির, সুক্ষ্ম, সনাতন ধারণাকে সে লালন করেনি। নারীকে সে দেবী নয়, নারী রূপেই দেখেছে। বাস্তব প্রতিকূলতাকে কৌশলে অতিক্রম করে তাই সে হতে পেরেছে বিজয়ী।

দর্পহরণ

স্বামী-স্ত্রীর দৈনন্দিন,দাম্পত্য মাধুর্য, বিচ্ছেদ যাতনা তর্ক-বিতর্ক গল্প দর্পহরণ (১৯০২) । সব কিছুকে ছাপিয়ে উভয়ের সাহিত্য চর্চার বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এ সাহিত্য চর্চাকে কেন্দ্র করে নারী সহনশীলতা, মেধা স্বাতন্ত্র্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি পুরুষের মিথ্যা অহংকার সুক্ষ্ম ঈর্ষাবোধ এবং পরিশেষে দর্প চুর্ণ হয়েছে। তবে পুরুষের অকপট স্বীকারোক্তি গল্পের নারী চরিত্রের প্রতি আন্তরিক অনুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ।

গল্প-কথক শ্রী হরিশচন্দ্র হালদারের স্ত্রী শ্রীমতি নির্ঝরিণী দেবী। বিদ্যানুরাগী,সাহিত্যানুরাগ বিনয়, নিরহঙ্কার মনোভাব তাকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রচনায় তার পারদর্শিতা স্বামীর মনে সুক্ষ্ম ঈর্ষাবোধের জন্ম দিয়েছে। মনে মনে এই বিদুষী নারীকে সে প্রতিযোগীও ভেবেছে। যদিও শ্বশুর মশাই পুত্রবধূর এই সাহিত্যানুরাগকে অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেছেন। অকাতরে উৎসাহ দিয়েছেন, তথাপি নায়ক হরিশচন্দ্র স্ত্রীর এই প্রতিভা ও প্রশংসাকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।বরং স্ত্রীর প্রতিভাকে অবদমন এবং নিরুৎসাহিত করতে সে সুক্ষ্ম কৌশল অলম্বন করেছে, সুক্ষ্ম ঈর্ষাবোধ তাকে আত্মাম্বরিত পথে ধাবিত করেছে ক্রমশ:

Dhaka University Institutional Repository

'বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়েছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরাজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া অভিভূত করিতে ছাড়িনাই। সে কোকিলের উপর একটা কী লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলার্ক্ ও কীটসের নাইটিঙ্গেল শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমি ও যেন শেলি ও কীটসের গৌরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রীও ইংরাজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। ------- নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে।'৩৩

স্ত্রীর এই সাহিত্য অনুরাগকে মূল্যায়ণ করতে চায়নি হরিশচন্দ্র। বরং লোকসমাজে স্ত্রীর প্রতিভার প্রচার তার মধ্যে এক ধরণের হীনমন্যতাবোধের জন্ম দিয়েছে। তৈরী করেছে এক ধরণের দ্বন্দ্বময় মানসিকতা। অপরিচিত এক ভদ্রলোক পরিচয় হবার পর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'শ্রীমতি নির্ঝারিণী দেবীর স্বামী'। তখন সে কুণ্ঠাবোধ করেছে স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত হতে। সদর্পে প্রভুত্ববাদী পুরুষের মতো সে জবাব দিয়েছে, 'আমি তাহার স্বামী কি না, সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনি আমার স্ত্রী বটেন।' ৩৪ লোক সমাজের স্ত্রীর প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে তার চিত্ত প্রসন্ন হতে পারেনি। গল্পে সে কথা সে স্বীকার করেছে অকপটে: 'বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি নাই।'৩৫ কিন্তু হরিশ চন্দ্র যখন পাড়ার ক্লাবে 'প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য' বিষয়ে বক্তৃতা করবার জন্য (মনে মনে স্ত্রীকে প্রতিপক্ষ ভেবে) উঠে পড়ে লেগেছে, তখন নির্ঝারিণী দেবী সভাস্থলে স্বামীর দুরবস্থা কল্পনা করে সবিনয় এবং কৌশলে তাকে নিবৃত্ত করেছে। এক্ষেত্রে নির্ঝারিণী দেবীর মধ্যে কোন আত্মদম্ভ নয় বরং স্বামীর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বলা বাহুল্য, হরিশচন্দ্রও স্ত্রীর কৌশল বুঝতে পেরেছে। অতঃপর সে আরও হীনমন্যতার গভীরে পতিত হয়েছে। তার মনোকথনে সে পরিচয় বিধৃত আছে :

'আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল, আর সব ভালো হইল কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই -যে সংস্কার, এটা ভালো নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন- কোন্‌দিন বা মশারির মধ্যে নাইট স্কুল খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াবার চেষ্টা করিবেন।' ৩৬ অতঃপর ঈর্ষাবশত স্ত্রী সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের সূচনা । স্ত্রী সাহিত্যরচনাকে সে নিছক মেয়েদের লেখা হিসেবে গণ্ডীবদ্ধ করে দেখতে চেয়েছে। তার মতে, 'লিখিবার যোগ্য কোন লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।'৩৭ নির্ঝারিণী দেবী এ কথার প্রতিবাদ করেছে বটে কিন্তু তখন থেকেই তার মধ্যে একধরণের অভিমান এবং অপমানবোধ কাজ করেছে। যে বোধ তার সমস্ত সৃষ্টিশীলতাকে বিনষ্ট করতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রলুব্ধ করেছে। অবশ্য 'উদ্দীপনা' পত্রিকায় গল্প রচনা প্রতিযোগিতায় স্ত্রী কৃতিত্বে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। এভাবেই তার 'দর্পচূর্ণ' হয়েছে। স্ত্রীর কৃতিত্বে তখন সে গর্ববোধ করেছে। 'এ নির্ঝরিণী যে আমারই 'নিঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই।'৩৮ স্ত্রীর প্রতিভাকে সে স্বীকৃতি দিয়েছে, প্রকাশও করতে চেয়েছ। কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাতপ্রাপ্ত নির্ঝরিণী দেবীতার আগেই তার সমস্ত রচনা অনলে বিসর্জন দিয়ে তার প্রতিভা-চর্চার চিরসমাপ্তি ঘটিয়েছে। 'আমি কি জানি না যে আমার ছাই লেখা। স্ত্রী লোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা প্রশংসা করে।'৩৯ তার এ কথার অভিমান এবং অপমানের অভিযোগ সুস্পষ্ট। সেকথা হরিশচন্দ্রের কথার মধ্যেও পরিস্কার বোঝা যায়: 'ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নিঝরকে সাধ্য সাধনা করিয়াও একছত্র লিখাইতে পারি নাই।'৪০ নির্ঝরিণী দেবীর আত্মমর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বই তাকে স্বতন্ত্র নারীর মর্যাদা দান করেছে। এ গল্পে স্ত্রী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য দাম্পত্য-বিচ্ছিন্নতার সূত্র হতে পারত। কিন্তু সে দকে না গিয়ে গল্পে দাম্পত্য সম্মিলনের চিত্রটিই মুখ্য হয়ে ওঠেছে।

মাল্যদান

নিছক একটি প্রেমের গল্প 'মাল্যদান'(১৯০২) 'প্রেমের গল্প হিসেবে মাল্যদান'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প যেখানে প্রেমের প্রথম বিকাশ অবিবাহিত নায়িকার দিকে থেকে হয়েছে।' ৪১ প্রেমের ক্ষেত্রে নায়ক এবং নায়িকার সম্পর্ক তৈরীতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে পটল, নায়কের বোন। মাতৃ-পিতৃহীন কুড়ানি-এ গল্পের নায়িকা, পটলের স্নেহে-যত্নে পালিতা। 'প্রফুল্লতার রসে পরিপুর্ণ'৪২ পটলের অতি ঠাট্টার কারণে কুড়ানির মনে যতীনকে ঘিরে প্রেমের বিকাশ।

'আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?' আমার ভাইকে তুমি বিয়ে করিবি?' 'তোর চোখ খোলাইবার জন্য বর যে আজ অনেক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে-আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পায়ের ধুলা নে।'৪৩ প্রভৃতি কথা কুড়ানির মনে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমের উন্মেষ ঘটিয়েছে। এক্ষেত্রে যতীন যদিও প্রথম দিকে পটলের এ সব রসিকতাকে ঠাট্টা হিসেবেই দেখেছে, তথাপি এক ধরণের তরল আবেগ তাকে কুড়ানির প্রতি ক্রমশ দূর্বল করে তুলেছে। কুড়ানির প্রতি মমতায় তার চিত্ত হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল :

> 'যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে তাহার জীবনের কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে- তাহাকে লইয়া কৌতুক করা যায়।'৪৪

কেবল তাই নয় যতীনের জন্য চায়ের পেয়ালা হাতে সকরুণ ভয়ে ভীত কুড়ানিকে দেখে যতীনের মনে হয়েছে 'এই মানব জন্মের হরিণ শিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়।'৪৫ যতীনের এই ক্ষণিক দুর্বলতা কুড়ানির প্রেমকে সমর্থন জানিয়েছে। এই প্রেমের বিকাশের মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে কুড়ানি বালিকাসত্তা থেকে নারীত্বে উত্তরণ করেছে। তার দেওয়া বকুল ফুলের মালা ফেলে

Dhaka University Institutional Repository

রেখে যতীন যখন চলে গেছে সবার অগোচরে, তখন কুড়ানি যেন এক 'অতল বেদনার' মধ্যে পতিত হয়েছে। সবকিছু তার কাছে মনে হয়েছে শূণ্য :

> 'সমস্ত কঠিন প্রহেলিকা । কী হইল, কেন হইল তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা কিছু-এই সমস্তই এমন একেবারে শূণ্য হইয়া গেল কেন।' ৪৬

এমনকি যতীনের চলে যাওয়াতে কুড়ানি অনুভব করেছে বিচ্ছেদ-বেদনা। এক্ষেত্রে পটলের সান্তনা যেন তোর এ বেদনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বালিকাসত্তার 'কুণ্ঠিত প্রেম'নারী রূপী কুড়ানির বিরহ-ব্যথাকে প্রকাশ্য অভিমানী করে তুলেছে। তাই সে পটলের দেয়া সমস্ত উপহার ফেলে পালিয়েছে।

সে অভিমান কেবল পটলের প্রতিই নয়, যতীনকে ঘিরেও আবর্তিত। গল্পের শেষে যতীন যখন কুড়ানির কাছে তার বকুল ফুলের মালাটি গলায় পরিয়ে দিতে বলেছে, তখন যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়টুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদারের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, ''কী হবে দাদা বাবু।''৪৭ 'একান্ত তরল বেদনার উপসংহার।'৪৮ এ গল্পকে কোন বিশিষ্ট মাত্রা দান করে নি। বরং 'নষ্টনীড়ে'র পরে এ গল্পের কাহিনী , চরিত্র যেন ছন্দ পতন বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ পৃ. ১৩৬

২. পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৬

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৪০৫, পৃ. ৩৮৫

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৬

৮. ক্ষেত্রগুপ্ত রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৫৪

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৪১৫

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৬

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫-৪১৬

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৭

১৫. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৮, পৃ. ১৬৫-১৬৬

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৪১১

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৯

১৮. অশ্রুকুমার সিকদার, যুগলের নিঃসঙ্গতা, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী কলকাতা,পৃ.২৮

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৪২০

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০

২৫. অশ্রুকুমার সিকদার , যুগলের নিঃসঙ্গতা, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৮, পৃ. ১৯

২৬. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ , পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৮, পৃ. ১৫১

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

৩২. আনোয়ার পাশা ,রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, প্রথম খণ্ড, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৬৯

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৪২২-৪২৩

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬

৪১. আনোয়ার পাশা, রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩২; পৃ. ৭২

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৪২৯

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬

৪৮. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৮,পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ তৃতীয় পর্বের গল্পে নর-নারী সম্পর্ক (১৯১৪-১৯৪০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্প বলতে ১৯১৪-১৯৪০ পর্যন্ত কাল পরিসরে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সমূহকে নির্দেশ করা যেতে পারে। নর-নারী সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম পর্ব (১৮৯১-১৯০০) এবং দ্বিতীয় পর্বের (১৯০১-১৯১৩) অধিকাংশ গল্পে পুরুষ চরিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকাসূত্রে নারী মনের বিচিত্র রূপ এবং রূপান্তর অনিবার্যভাবে লক্ষ করা গেছে। এক্ষেত্রে নারী ব্যক্তিত্ব, নারী স্বাতন্ত্র্য এবং নারীমুক্তির অস্ফুট ধ্বনিটিও যেন কল্লোলিত হয়ে উঠেছে ক্রমশ। তৃতীয় পর্ব (১৯১৪-১৯৪০) থেকে নারীমুক্তির এ ধ্বনি আর অস্ফুট থাকেনি। বরং মঞ্জরিত কদম্বের ন্যায় শতধারায় যেন বিকশিত হয়ে উঠেছে। ''প্রথম বিশ্বযুদ্ধত্তোরকালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজ-রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ,মূল্যবোধের পরিবর্তন, নান্দনিক অভিরুচির যুগান্তকারী রূপান্তর পুরুষ সম্পর্কে নারীর দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলে। সৃষ্টিশীল জীবনের সুচনালগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে নারীর অস্তিত্বগত অবস্থানের পটভূমিতে বিচার করেছেন। নারীর অস্তিত্বগত অবস্থানের আধুনিকায়নের ফলে এ পর্যায়ে সেই সম্পর্ক হয়ে উঠেছে জটিল, সুক্ষ্ম ও বহুস্তরময়''।১

হালদারগোষ্ঠী

হালদারগোষ্ঠী (১৯১৪) গল্পটি অভিনব এবং স্বতন্ত্র যেখানে পুরুষ অন্বেষণ করেছে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায়, আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যার মুক্তি। বানোয়ারিলাল,যার চরিত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গল্পগুচ্ছের অন্যান্য পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু বিশেশ কতগুলো চারিত্রিক লক্ষণের সমন্বয়ে এখানে যে চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে তাতে 'শেষ পর্যন্ত এমন একটি মানুষ জম্মাল, যার তুল্য পৌরুষ রবীন্দ্র-গল্পের পাত্রদের মধ্যে চোখে পড়েনা। বানোয়ারি যে ধাতুতে তৈরী গল্পগুচ্ছে তা অপরিচিত নয়, কিন্তু বানোয়ারি একেবারে নতুন।' এ গল্পে যা দেখানো হয়েছে তা হলো 'বংশের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ, আসলে স্বাতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।'২ তার এই বক্তিস্বতন্ত্র্যের উৎসমূল আর্বতিত হয়েছে এক নারীকে ঘিরেই, সে তার স্ত্রী কিরণলেখা। যদিও স্বামীর ভালোবাসার প্রতি কিরণছিল উদাসীন, নির্মোহ স্বভাবের, তথাপি বানোয়ারি সর্বদাই স্ত্রীকে ভালেবাসা নিবেদনে, পৌরুষের পরিচয়দানে সর্বদাই থেকেছে সচেষ্ট। গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশের বড়োবাবু হয়েও বিষয় এবং অর্থে তার বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব নেই, বরং কর্তার প্রশ্রয়ে ভৃত্য নীলকণ্ঠ তার উপর আধিপত্য বিস্তার করায় স্ত্রীর কাছে তার পৌরুষবোধ, যোগ্যতা খর্ব এবং বাধাগ্রস্থ হয়েছে বারবার-এই অপমানবোধ থেকেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভাসন। স্নেহে, ভালোবাসায়, প্রেমে, ঈর্ষায়, ক্রোধে বানোয়ারি একজন স্বাভাবিক মানুষ যার

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয় ছোট ভাইয়ের প্রতি মমতায় যেমন পরিপুর্ণ, তেমনি,আবার স্ত্রীর প্রতি প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশেও সদা উন্মুখ।

'স্ত্রীকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ, তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানা রকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বানোয়ারির এই শখ কোনো মতেই মিটিতেছেনা। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও পরকাশ করিতে পারিল না। আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মান মর্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন-সাধারণত লোকে যাহা কমানা করে,তাহার সমস্ত লইয়া ও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।''৩

ব্যক্তি চরিত্রের এই অতৃপ্তি,অচরিতার্থতা এবং অপ্রাপ্তি জনিত উৎস থেকেই বানোয়ারির আত্মমর্যাদাবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। বানোয়ারি সামান্য প্রজা মধুকৈবর্তকে জমিদারের দেনা থেকে রক্ষা করতে অক্ষম-একথা স্ত্রীর মুখে শুনে তার আত্ম-সম্মানে যেন শেল বিধেঁছে। মাঘী পূর্ণিমার ফাল্গুনের রাতেমোহময় পরিবেশে স্ত্রীর সামনে যেতে তার পুরুষোচিত বাক্তিত্ব কুণ্ঠিত হয়েছে। 'যৌবনের ভরা পেয়ালা আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এত বড় কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া।' ৪

ছোট ভাই বংশী, যাকে বানোয়ারি মাতৃস্নেহে লালন করেছে সে যখন পিতার কাছে নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী হলো না আপন স্বার্থ বিবেচনা করে, তখন বানোয়ারি একাই পিতার সামনে নীলকণ্ঠের আধিপত্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে সদর্পে। কিন্তু যখনই সে জেনেছে ছোটভাই বংশীই শুধু নয়, স্ত্রী কিরণও হালদারগোষ্ঠীর পক্ষে, 'তখন সেইটিই বানোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক অনভিস্ফুষ্ট চাঁপা ফুলটির মতো পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্থ হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বানোয়ারির সহিত সম্পুর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।' ৫

পিতার অবহেলা, ভৃত্য নীলকণ্ঠের আধিপত্য, ছোটভাই বংশীর বিপক্ষে যাওয়া বানোয়ারির আত্মসম্মান-বোধে আঘাত করেছে, অপমান করেছে। কিন্তু সে অপমান-শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে স্ত্রীর সমর্থন না পাওয়াতে। কেননা যে স্ত্রীর জন্যই তার এত প্রতিবাদের আয়োজন, সেই স্ত্রীকে সে যখন 'আপন বেদনার কাছে' পায়না, তখনই শুরু হয় তার দাম্পত্য বিচ্ছন্নতা। এ বিচ্ছিন্নতাকে আরও প্রকট করে তোলে বংশী-পুত্র হরিদাস।'নিঃসন্তান কিরণ তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লে, স্ত্রীর সঙ্গে বানোয়ারির মিলনে বিস্তর

Dhaka University Institutional Repository

ফাঁক পড়তে লাগলো।'৬ এই ভাবে বানোয়ারি ক্রমশ নিঃসঙ্গ, একাকী হয়েছে। কিরণের সাথে তার নির্লিপ্তভাবে সংসার যাপন এবং কিরণের তাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব না করা তাদের দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতারই প্রমাণ। এই দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতাই বানোয়ারিকে ক্রমশ ঈর্ষা, প্রতিশোধপরায়ণতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানুষ হিসেবে স্ত্রীর কাছে তার চেয়ে বংশীল মূল্য বেশী, বংশী-পুত্র হরিদাসের প্রতি বানোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ও অমঙ্গলের আশংঙ্কায় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশ্বাসহীনতা, নীলকেঠর ক্রম আধিপত্য বিস্তার প্রভৃতি তার জীবনকে বিবর্ণ বিরস এবং জটিলতর করে তুলেছে। এই মানসিক জটিলতা ক্রমেই তার অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তুলেছে। আর যে বিষয়টি তাকে অস্থির করে তুলেছে, তার ব্যক্তিত্বকে 'এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে'৭ দিয়েছে সামনের দিকে, সেটি তার পিতৃনির্ধারিত উইল। যাবজ্জীবন দুইতশ টাকা করে মাসোহারা বরাদ্দ- এ যেন হালদার বংশের বড়ো বাবুকে চরমভাবে অবাঞ্চিত ঘোষণা । এই অসহ্য নৈঃসঙ্গবোধ ও অপমানবোধ থেকে তার মনুষ্যত্ববোধ ক্রমেই যেন মুক্তিকামী হয়ে উঠেছে। প্রাণপ্রিয় স্ত্রী এবং হালদারগোষ্ঠীর বিষয় সম্পত্তি তার কাছে গৌণ হয়ে দেখা দিয়েছে, মুখ্য হয়ে উঠেছে তার 'স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।'৮

> 'এ বাড়ির মেঝে বানোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহারই দুই চক্ষকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই'।৯

'মনোহরলাল নীলকণ্ঠ কিরণ বংশী -এরা সবাই ব্যক্তিগত বিচিত্রতায় স্বতন্ত্র হলেও একটি জমিদার বংশের (যার নামে গল্পের নাম হালদারগোষ্ঠী) কতগুলো নিশ্চিত অনড় মূল্যবোধ। এইসব সুস্থির পেরেক পুতে সে ফ্রেমটি তৈরী তার সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় ফিউডালতন্ত্র। এর বিরুদ্ধে ব্যক্তি বানোয়ারি লড়াই করেছে'।১০ এ সংগ্রামে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিরও ক্রম পরিবর্তন ঘটেছে। গল্পের শুরুতে কিরণের বর্ণনা :

> কিরণলেখার বয়স যতই হউক, চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলে মানুষটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতরো গিন্নিবান্নি ধরণের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহা একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ সে যেন বড়ো স্বল্প। ১১

গল্পের শেষে আত্ম-আবিষ্কারের পর বানোয়ারির দৃষ্টিতে কিরণলেখার বিবর্তন :

> সেই তন্বী এখনতো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকে কবিতাগুলাও বানোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।১২

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে কেবল কিরণলেখারই বিবর্তন ঘটেনি, বানোয়ারিও বিবর্তিত হয়েছে। মুক্তির অন্বেষায় তাই সে বেরিয়ে পড়ে চাকরি খুঁজতে। বংশগৌরব স্ত্রী এমনকি পিতৃশ্রাদ্দের দায়িত্বটুকুও তখন তার কাছে গৌণ হয়ে যায়। এই ভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ঘটেছে তার ব্যক্তি-সত্তার জাগরণ, যার মধ্যে অনিবার্যভাবে নিহিত রয়েছে তার 'উত্তরকালীন নিঃসঙ্গতার বীজ।' ১৩ আধুনিক যুগের মানুষ যে সমাজ এবং সংসারের অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও একলা বানোয়ারিকে দেখে সে কথা স্পষ্ট হয়। দাম্পত্য সান্নিধ্যের মধ্যে থেকেও মনের দিক থেকে তার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়া এ যুগের ব্যক্তি চরিত্রের রুচিবোধের স্বাতন্ত্র্যকেই নির্দেশিত করে। আধুনিক যুগের আধুনিক মানুষের বৈশিষ্টাকে ধারণ করেছে বানোয়ারি।

হৈমন্তী

'হালদারগোষ্ঠী' (১৯১৪) গল্পে বানোয়ারিলাল স্ত্রী, বংশগৌরব সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করেছে আত্মমুক্তির স্বার্থে। 'সোনার শিকল' তাকে বাধতে পারেনি, সরব প্রতিবাদ করেছে সে তার বিরুদ্ধে। 'হৈমন্তী' (১৯১৪) গল্প হৈমন্তীও চিত্ত মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছে। তবে এক্ষেত্রে তার প্রতিবাদের ভাষা সরব নয়, নীরব। শ্বশুরালয়ের কন্টকশয়নের মধ্যে থেকেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে সে নিজেকে মুক্ত রেখেছে সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে। কেননা হিমালয়ের পাদদেশে 'সতেরো বৎসর কাল অন্তরে বাহিরে কতো বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে,' ১৪ এই গিরিনন্দিনী। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ পিতা গৌরিশংকরের আদর্শে স্নেহে শিক্ষায় বড়ো হয়েছে মাতৃহীনা হৈমন্তী। মেয়েকে তিনি অনেক পড়িয়েছেন-শুনিয়েছেন, কিন্তু কখনো দেবতা সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেননি। কারণ ,তার মতে 'আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।' বস্তুত গৌরিশংকর বাবু 'ব্রাহ্মও নন, খৃষ্টানও নন, হয়তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই।' ১৫ পিতার উদারনৈতিক শিক্ষা এব গম্ভীর প্রকৃতি ছিল হৈমন্তীর চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান। হৈমন্তী এবং গৌরিশংকর বাবুর পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল পিতা-কন্যা নয়, সবকিছুকে ছাপিয়ে তারা উভয়ে উভয়ের কাছে ছিল। 'সকলের চেয়ে দরদের'। ১৬ মানুষ। শ্বশুরালয়ে পিতা সম্পর্কে কটূক্তির বিরুদ্ধে তাই সে দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু আত্মাবমাননার যন্ত্রণাকে সে নীরবে সহ্য করেছে। 'অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহবরে' ১৭ ক্রমাগত নিপতিত হয়েছে।

অপু কোলকাতার নবাশিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। সে তার রোমান্টিক দৃষ্টির আলোকে বিয়ের পুর্বে 'ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ,সাদাসিধা দুটো চোখ এবং সাদসিধা একটি শাড়ি' ১৮ পরিহিতা হৈমন্তীর ছবি দেখে এক আশ্চর্য মহিমা আবিষ্কার করেছে। সে ছবি যে অপুকে বিমোহিত করেছে সে তার রোমান্টিক ভাবালুতারই প্রমাণ :

> 'পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া

Dhaka University Institutional Repository

> চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।'১৯

হৈমন্তীকে সে ভালোবেসেছে । স্ত্রী হিসেবে তাকে অপু 'সম্পত্তি নয় সম্পদ'২০ বলে ভেবেছে। নবীন ছাত্রের নব্য আদর্শ অনুসারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়নও অপুর কাছে হয়ে উঠেছে আধুনিকতাস্পর্শী :

> 'দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না, এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল, সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।'২১

সন্দেহ নেই, স্ত্রী সম্পর্কে অপুর এ মানসিকতা তার আধুনিক শিক্ষারই ফল। পুরনো আদর্শ, সনাতন চিন্তা-চেতনাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে অপু হয়ে উঠতে চেয়েছে সংস্কারমুক্ত। কিন্তু যে সংস্কার বংশ পরম্পরায় রক্ত কণিকার মধ্যে ফল্গুস্রোতের মতো প্রবহমান, তাকে অপু অস্বীকার করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। এখানেই অপুর মনের স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যাবে। বিয়ের পরে হৈমন্তী সম্পর্কে সে বলেছে 'সে যে আমার সাধনা ধন ছিল, সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ'। আবার এই অপুই মা-বাবার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারেনি। হৈমন্তীকে শ্বশুরালয়ের কন্টকশয়ন থেকে বের করে আনতে পারেনি। বরং 'ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি'২২ দিয়েছে কাপুরুষোচিত উপায়ে। তারপরে তার স্বীকারোক্তি :

> 'যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন।'২৩

এই সংস্কারাচ্ছন্ন, স্ববিরোধজাত মানসিকতা অপুর মনে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। হৈমন্তীর মনের ব্যাপ্তির সাথে যার মেরুদূর ব্যবধান। বিয়ের আসরে যাকে পেয়ে অপু আত্ম তৃপ্ত হৃদয়ে ভেবেছে 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম। -----এ যে দুর্লভ।'২৪ সেই হৈমন্তীর মনের 'নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপ'২৫ প্রত্যক্ষ করেও অপু তার কোন প্রতিকার করতে পারেনি। হৈমন্তীর অন্তরে অন্তরে মুহূর্তে মুহূর্তে যন্ত্রনার ছবি প্রত্যক্ষ করেও সে বলেছে 'তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারিনা-তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়'?২৬ আধুনিক যুগের নবীন শিক্ষার্থী অপুর নব্য আদর্শ হৃদয়বেগ, প্রেম, ভালোবাসা সমস্তই তার 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে।'২৭ স্ববিরোধিতার কাছে পরাজিত হয়েছে। গল্পের শেষে তার প্রমাণ আরও প্রকটভাবে মিলবে: 'শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মা'র অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে।'২৮ রোমান্টিক ভাবালুতার মোড়কে সনাতন মূল্যবোধ

Dhaka University Institutional Repository

অপুর ব্যক্তি চরিত্রকে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছে। তাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও অপু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারেনি, নির্মাণ করতে পারেনি কোন আত্মমুক্তির পথ।

স্ত্রীর পত্র

'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪) গল্পে এসে রবীন্দ্রনাথ নর-নারী সম্পর্ককে নতুনভাবে মূল্যায়ন করেছেন। বিশেষত পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান, মর্যাদা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নারীর যে আত্মোপলব্ধি, সেই দিকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। 'মৃণালের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এ গল্পের বিষয় তা এদেশের ফিউডাল সমাজের নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা নিয়ে একটা সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়ন।'২৯

তার অকপট সাহসী উচ্চারণে তার চরিত্রের সততা এবং দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর গ্রহণযোগ্যতার মূল্যায়নের মাপকাঠি প্রথমত রূপ দ্বিতীয়ত কর্মক্ষমতা-এসত্যটি মৃণাল যথাযথ ভাবেই নির্ণয় করেছে। প্রথমগুণের প্রমাণ সে নিজেই আর দ্বিতীয় গুণের প্রমাণ বিন্দু। বুদ্ধিবৃত্তি বা কলাবৃত্তির বিকাশ সেখানে নিতান্তই অনাবশ্যক এবং উপেক্ষিত। এভাবেই পুরুষতন্ত্রের কাছে নারী হয়ে উঠেছে বস্তু বিশেষরূপে। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষের সামনে মৃণালের যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়,তার মধ্যে দিয়েই সে দিকটি হয়েছে নির্মমভাবে উন্মোচিত। মৃণালের সহজ স্বীকারোক্তি এখানে নারী হিসেবে তাকে করেছে স্বতন্ত্র :

> ''বাবার বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন।শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা;কিন্তু সেই রূপের গুমরতো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে সে দামই দেবে সেই তার দাম। তাইতো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।
>
> সমস্ত বাড়ির , এমনকি সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল--আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিলনা।''৩০

স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বৈষম্য এ পর্বের গল্পে ক্রমেই নারীর মধ্যে এনেছে একক ও স্বতন্ত্র মাত্রা। মৃণাল যদিও রূপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বামীগৃহে এসেছিল, তথাপি তার দাম্পত্য সম্পর্ক যে ক্রমেই বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হচ্ছিল, মৃণালের উক্তিই তার প্রমাণ : 'আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগেনি।'৩১ পারস্পরিক মতানৈক্য, রুচি ও মানসিকতার ভিন্নতা, ব্যক্তিত্বের তারতম্যের কারণেই মূলত দাম্পত্য জীবনে মৃণাল হয়েছে নৈসঃঙ্গের নিকটবর্তী। কেবল দাম্পত্য

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্নতাই নয়, বস্তুত স্বামীগৃহের প্রত্যেক সদস্যের সাথেই মৃণালের ছিল মানসিক ব্যবধান। এই পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দিয়েই মৃণাল ক্রমশ হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র, ব্যক্তিত্বময়ী :

> 'আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সেছাইপাঁশ যাই হোক -না, সেখানে তোমাদের অন্দর মহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি। সেইখানে আমি আমি'। ৩২

মৃণালের একথা থেকেই বোঝা যায়, মানসিকভাবে সে কতটা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করত স্বামীগৃহে। কেবল তাই নয় তার মেধা, তার কবি-প্রতিভাও যে সেখানে কী দারুণভাবে উপেক্ষিত ছিল, সেটিরও আভাস পাওয়া যায় তার লুকিয়ে কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে : 'আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি'।৩৩ মন এবং মেধার স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে লুকিয়ে লালন করেছে মৃণাল, সংগোপনে তার প্রকাশ করেছে; কিন্তু তার যে শাণিত ব্যক্তিত্ববোধ আছে, সেকথাটি সে বুঝিয়ে দিয়েছে সবাইকে সুস্পষ্ট উচ্চারণে: ''আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সেটিকে আছে।'' ৩৪

বস্তুত মৃণালের অন্তরের কবিসত্তাই তাকে অন্যসব নারী থেকে পৃথক করেছে। সমাজের দশটা নারীর মতো সেও জীবনটা ঘরকন্নার মধ্যে দিয়েই সমাপ্ত করতে পারতো, কিন্তু কবিসত্তার উপস্থিতি তাকে দান করেছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, করে তুলেছে অধিকতর সংবেদনশীল। বস্তুত, অবহেলিত লাঞ্ছনাময়, উপেক্ষিত জীবনকে পেছনে ফেলে নারীমুক্তির পথটিও মৃণাল অবিষ্কার করতে পেরেছে এই সংবেদনশীল মন থেকেই। ভাবনাহীন,স্বচ্ছল, কিন্তু অবমূল্যায়িত এবং পরাধীন জীবনের চেয়ে আত্মসম্মান এবং আত্মমুক্তি যে অনেক বড় এবং শ্রেয় -এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছে মৃণাল। তাই সে স্বামীকে বলতে পারে অবলীলায়: 'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবনা। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।'৩৫

বিন্দু নামের মেয়েটির অন্যায় এবং মর্মান্তিক মৃত্যু মৃণালের আত্মমুক্তিকে ত্বরান্বিত করেছে। বিন্দুর ওপরে অত্যাচার ,নির্যাতন ও অপমানের গ্লানি তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে প্রবলভাবে। পুরুষশাসিত সংসারে নারীর মন বলে কিছু থাকতে নেই, তার চাওয়া-পাওয়ার প্রতি পুরুষের উদাসীনতা সে লক্ষ্য করেছে। এক্ষেত্রে পুরুষের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তই নারীকে মাথা পেতে নিতে হয়। একথা কেবল বিন্দু নয়, যে কোন মেয়ের বেলাতেই সত্য। এ আরোপিত লাঞ্ছনাকে মৃণাল মেনে নিতে পারেনি বলেই সন্ধান করেছে আত্মমুক্তির। বিন্দু কেবল বিন্দু নয়, মৃণালের কাছে সে 'জীবনের কণা' ৩৬ পুরুষশাসিত সংসারে নারীর স্থান বিন্দুই যেন তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল :

Dhaka University Institutional Repository

> ''বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুরোদ্গম করে; শেষ কালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোট্টো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হলো।''৩৭

বিন্দুর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সংসারের সবাই যখন তার ওপরে অন্যায় কার্যকলাপে লিপ্ত ঠিক তখনই এর প্রতিবাদ হিসেবে মৃণাল বিন্দুর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ, বিন্দু যে কেবল অসহায়, কেবল একজন নারী তাই নয়, মৃণালের কাছে বিন্দু 'জীবনের কণা'। যে জীবন নারী -পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। মৃণালের এই সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্বামীর সঙ্গে তার দূরত্বও বেড়েছে ক্রমশ। গল্পে দাম্পত্য বিরোধ কিংবা স্বামী সম্পর্কে কোন অভিযোগ সে করেনি। বরং বলেছে ''দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে'' তোমাদের সংসারে তা আমার ছিলনা। তোমাদের ঘরে খাওয়া পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি'।৩৮ কিন্তু বিন্দুর প্রতি মৃণালের ভালোবাসাকে বন্ধ করতে তথা মৃণালকে প্রতিরোধ করতে যে সমস্ত ব্যবহার করেছে তা স্ত্রীর আত্মসম্মানের প্রতি চরম অবমাননাকর। এমনকি মৃণালের হাত খরচের টাকা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। মৃণালের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী স্বামীর সে নীচতায় দমে যায়নি মোটেও। বরং দ্বিগুণ সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সংযত করেছে, নিজের সিদ্ধান্তে থেকেছে অটল, পুরুষের হীনমন্যতার প্রতিবাদ জানাতে সোচ্চার হয়েছে। স্বামীর কাছে লেখা পত্রে তার প্রমাণ মেলে :

> 'বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর মতির মা যখন আমার এ'টো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এলো তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাদুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হওনি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এলো না'।৩৯

পুরুষ শাসিত সমাজে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এই যে বৈষম্য, তাকে মৃণাল ঘৃণা করেছে স্পর্ধাভরে। এমনকি নিরুপায় বিন্দুর মৃত্যু নিয়ে যখন বাড়ীর পুরুষেরা করেছে উপহাস, বলেছে এ সমস্ত নাটক করা- তার প্রতিও মৃণালের তীব্র ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপিত হয়েছে। 'নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালী বীর পুরুষের কোঁচার উপর দিয়ে হয়না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত'। ৪০

এ গল্পে মৃণালের অভিযোগ কেবল তার স্বামীর প্রতি নয়, সমাজের সকল পুরুষের প্রতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ, সংসার। সে কারণে মৃণালের চিঠিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'তোমরা', 'তোমাদের' শব্দ ব্যবহৃত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। পুরুষসৃষ্ট চার দেয়ালের অন্দরমহলে নারীর অপমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে মৃণাল। বিদ্রোহী নারী এখানে পুরুষের পাশে সমমর্যাদা দাবী করেছে। আত্মসম্মানের লাঞ্ছনার কারণেই মৃণাল খুঁজেছে আত্মমুক্তি। সেমুক্তি মৃত্যুর মধ্যে নয়, অন্বেষণ করেছে কোলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিকে ছাড়িয়ে, মেজো বউয়ের খোলস পরিত্যাগ করে আপন ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসনের মধ্যে দিয়ে। সেখানে সে পেয়েছে অনন্ত জীবনার্থ। অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার অনন্ত প্রেরণা। তাই সে বলতে পারে 'লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা, আমিও বাঁচব'।৪১ এইভাবে পুরুষের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইঙ্গিতে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর পুরুষ- শাসনের প্রতি মৃণালের তীব্র ব্যক্তিত্ব উৎসারিত সমস্ত ঘৃণা, প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে 'তোমাদের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন' শব্দের মধ্যে দিয়ে। পুরুষের পায়ের তলায় আর নারীরা পিষ্ট হবেনা, অত্যাচারিত, অবদমিত হবে না, আশ্রিত হবে না। সে আশ্রয়কে ছিন্ন করে নারীরা বেরিয়ে আসবে, জীবনের সুষ্ঠু সুন্দর বিকাশে নিজেকে নিযুক্ত করবে এই প্রত্যয় নিয়ে নারীরা অগ্রগামী হবে, বেঁচে থাকার মন্ত্রে হবে দীক্ষিত, যেমন হয়েছে মৃণাল। এদিক থেকে 'মৃণাল' নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পুরুষশাসিত সমাজ, সংসার ছেড়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায় বর্হিজগতে পা বাড়ানোর এই যে প্রত্যয়, যা রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারীদের মধ্যে মৃণালের মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং প্রবল, তা প্রথম ধারণ করেছে উনবিংশ শতাব্দীতে হেনরিক ইবসেন রচিত 'A Dolls House' -এর 'নোরা' চরিত্র। মেয়েরা প্রথমে পিতার অধীনে, তারপর স্বামীর অধীনে, তারপর সন্তানের অধীনস্থ হয়ে জীবন কাটায়। মেয়েদের এই সংসার জীবনকে সে পুতুলের খেলাঘরের সাথে তুলনা করেছে। এবং স্বামী সন্তান পরিত্যাগ করে সে তার বিপ্লবের সূচনা করেছে। কেননা সে মনে করে সে কেবল নারী নয়, সে একজন মানুষ। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সামাজিক পরিবর্তনের নোরা পথিকৃৎ, নিঃসন্দেহে। মৃণালও নোরার মতই নিজের পথ নিজেই সন্ধান করেছে। 'তবে সংসার ছেড়ে মৃণাল গিয়েছে শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রের ধারে জগদীশ্বরের কাছে। পুরুষ যে ওই জগদিশ্বরের নামেই তাকে মেয়ে মানুষ করে রেখেছে, তা জানে না মৃণাল।'৪২

নর-নারী সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র গল্পসমূহ তিনটি স্তরে বিভাজন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, নর-নারী সম্পর্কের ক্রম-রূপান্তর তথা ব্যক্তি ও সমাজ কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অনুভব, মর্যাদা, ও স্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ক্রম উন্মোচন দেখানো। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নারীর কিশোরীসুলভতা আর গ্রাম্য সারল্য দ্বিতীয় পর্বে এসে নাগরিক জীবনের স্পর্শে হয়ে উঠেছে অধিকতর 'ম্যাচিওড' । কোলকাতার যন্ত্রময় শাহরিক পরিবৃত্তে নারী-চিত্ত ক্রমশ হয়ে উঠেছে নিঃসঙ্গ, অন্তর্মুখী। এই অন্তর্মুখীতাই প্রান্তপর্বে এসে নারীর আত্মমুক্তির পথকে নির্দেশিত করেছে। পুরুষের ওপরে নিশ্চিন্ত নির্ভরশীল জীবনকে পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটি স্বতন্ত্র্য জীবন ভাবনা নারীকে করে তুলেছে আধুনিক, প্রগতিশীল। পাশাপাশি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টেছে। নারীকে কেবল গৃহবধূ হিসেবে মুল্যায়ণ করতে গিয়ে তারা হারিয়েছে নারীর ভালোবাসা, নারীর সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং ব্যক্তিটিকেও। তাই নারীকে মানুষ হিসেবে পাশে স্থান দিতে হয়েছে তাদের। সংসারের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নেও নারীর অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা। নর-নারী সম্পর্ক পরিবর্তনের এ ধারায় তৃতীয় পর্বে এসে 'শেষের রাত্রি'(১৯১৪) গল্প কোন নতুন মাত্রা যোগ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারটি এখানে অনুপস্থিত। এ গল্পের (১৯১৪) নায়িকা মণিকে তুলনা করা চলে প্রথম পর্বের 'মধ্যবর্তিনী'(১৮৯৩) গল্পের শৈলবালার সঙ্গে। উভয়েই যেন বয়সে, স্বভাবে, চিন্তায় সমধর্মী।

শেষের রাত্রি

ব্যক্তিত্বের জাগরন মূল বিষয় না হলেও দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার জায়মান বীজটি 'শেষের রাত্রি' গল্পকে আধুনিকতার মর্যাদা দান করেছে। নায়ক যতীনের শারীরিক অসুস্থতা দাম্পত্য সম্বন্ধের মাঝখানে নির্মাণ করেনি কোন সহমর্মিতার অথবা ভালোবাসার বন্ধন; বরং বলা চলে শারীরিক অসুস্থতাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'মানসিক চলাচলের'। ৪৩ মণি মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর প্রতি উদাসীন। ছোট বোনের অন্নপ্রাশনে পিতৃগৃহে যাবার আবশ্যকতা তার কাছে অধিক বলে মনে হয়। তাই সে তার সইকে নিঃসংকোচে বলে, ''তা আমি ভাই,তোমাদের মতো লোক-দেখানো ভান করতে পারিনে। পাছে কেউ কিছু মনে করে বলে মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।'' ৪৪ গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, বয়সের দিক থেকে এটি একটি অসম বিবাহ। মণি নিতান্তই 'চঞ্চলমতি সুখ পরায়ণ বালিকা' ৪৫ আর যতীন বয়সের স্বাভাবিকতায় প্রাজ্ঞ । তাই সে মণির ঔদাসীন্য সত্ত্বেও তার ওপর কখনো রাগ করতে পারেনি। বরং সহনশীলতার সঙ্গে মণির এ অবহেলাকে গ্রহণ করেছে; 'মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম, মনি নিজের মন এখনো বোঝেনি;' ৪৬ 'মণির হৃদয়ের জাগরণ'৪৭ না ঘটায় যতীনের দাম্পত্য জীবন নিঃসঙ্গতার আবর্তে নিপতিত হয়েছে। মণির জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়েছে যতীন। নৈঃসঙ্গের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে সে বলে, 'সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দুপুর রাত আরম্ভ হয়।'৪৮ তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল বিপরীতমুখী। তাই যতীন মণির জন্য যতই তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষা করেছে, মণি ততই যেন বহির্মুখী হয়ে উঠেছে। তাদের এ দাম্পত্য-বিচ্ছিন্নতা যতীনের মাসির দৃষ্টিও এড়ায়নি:

'কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে।' ৪৯

মনের মিল না হওয়াতে গল্পে এই দুই নর-নারীর মধ্যে যে সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, তা পরিণতিকে মর্মান্তিক করে তোলে। 'যতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারেনাই।দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপচলা বড়োকঠিন।'৫০ এভাবেই মণি যতীনের কাছে না-পাওয়া এক আরাধ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। 'যতীনের মনে নারী দেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে, মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শুণ্য থাকিতে পারে, একথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিলনা। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিলনা।'৫১

Dhaka University Institutional Repository

এগল্পে নারীর প্রতি পুরুষের আকাঙ্ক্ষা দেখানো হয়েছে। নারীর তাতে নেই কোন ভ্রূক্ষেপ। স্বামী-স্ত্রীর এই মিল-অমিলের মধ্যে দিয়েই প্রকট হয়ে উঠেছে দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা- আধুনিক মানুষের শারীরিক ও মানসিক রূগ্নতা তাদের মধ্যে 'দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে;তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে।'৫২ বস্তুত, এই জৈবিক এবং মানসিক অচরিতার্থতার যন্ত্রণাকে বুকে নিয়েই যতীনের গল্প শেষ হয়েছে। স্ত্রীর মানসিক জাগরণের প্রতীক্ষা করেছে সে। স্ত্রীর জন্য আকুলতা, ব্যাকুলতা শেষপর্যন্ত তার কল্পনায় এটি পরম রমণীয় স্বপ্ন হিসেবে প্রতীকায়িত হয়েছে 'অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল,তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ - সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী।'৫৩ যতীনের এ স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেছে। দাম্পত্য বিচ্ছেদের কাতরতা তার অবচেতন মনে জন্ম দিয়েছে এমন এক অনুভূতির যা তার অচরিতার্থতাজনিত মানসক্রিয়ারফল। সে স্বপ্ন দেখছিল মণি যেন দরজা ঠেলে তার ঘরে আসতে চাইছে, কিন্তু 'কোন মতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারলনা, মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়েই রইল।'৫৪ মণি চরিত্রটি প্রথম পর্বের গল্পের শৈলবালা'র (মধ্যবর্তিনী) মতো মনে হলেও গল্পের বিষয় এবং নামকরণ একটি ভিন্ন অর্থে প্রতীকায়িত হয়েছে যা একান্তভাবে আধুনিকতাস্পর্শী। দাম্পত্য সঙ্কটের ভয়াবহতা এপর্বের গল্পে এমনই গুরুত্ব পেয়েছে যা বিশ্বযুদ্ধোত্তর গল্পের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে আজও বহমান ও অনুসৃত ।

অপরিচিতা

ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূত্র ধরে 'অপরিচিতা' (১৩২১) গল্পে বিকশিত হয়েছে কর্মজীবী নারী চরিত্র 'কল্যাণী'। তার এ বিকাশের পশ্চাতে রয়েছে নায়ক অনুপম -এর ব্যক্তিত্বহীনতার ইতিহাস যদিও গল্পের শেষে নায়কের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ জাগ্রত হয়েছে। সে কারণে তার ব্যক্তিত্বহীনতার ইতিহাসটুকু তার কাছে কেবল বেদনাদায়ক,অনুতাপ-মুখর নয়, জীবনের প্রথম মধুরতম স্মৃতি হিসেবে তা অসামান্য, অমূল্য এবং পরম রমণীয়।

এ গল্পের নায়ক অনুপম-এর মধ্যে 'হৈমন্তী'(১৯১৪) গল্পের 'অপু' চরিত্রের একটি ছায়া লক্ষ করা যাবে। উভয়েই অভিভাবকের আদেশকে হিতাহিত বিচার না করে নতমস্তকে শিরোধার্য বলে মনে করে । তবে এক্ষেত্রে অপুর চেয়েও অনুপম অধিকতর শিক্ষিত -এম এ পাস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার মতো সাহস তারও নেই। তার চরিত্র গঠনে মা এবং মামার প্রভাবকে সে নিজেই স্বীকার করেছে এভাবে: 'মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে-বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই'। 'অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি------'। 'আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। -----যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট'।৫৫ বস্তুত মা এবং মামার আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে লালিত পালিত হয়ে অনুপম একধরণের হীন মানসিকতাকে লালন করেছে। ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ সব সময় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে। সে কারণে নিজের বিয়ের পাত্রীকে নিজে দেখার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সাহস করে তা বলতে পারেনা সে। তার এ নির্বিকার মনোভাবের

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাতে আরেকটি প্রধান কারণ তার বেকারত্ব। তার নিজের দৃষ্টিতেই দেখা যাক তার অলস,কর্মহীন জীবন কেমন ছিল:

'কিছুদিন পূর্বেই এম.এ. পাস করিয়াছি; সামনে যতদুর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ-ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই ; চাকরি নাই, নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছা নাই থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা'।৫৬

নারী সম্পর্কে একটি রোমান্টিক কল্পনা তার ছিল যার পুরোটাই ভাবালুতায় আবিষ্ট, বাস্তবে তার কোন কার্যকরিতা ছিলনা। নায়িকা কল্যাণীর ব্যক্তিত্বগঠনে তার পিতা ডাক্তার শম্ভুনাথ সেনের প্রভাব অনস্বীকার্য। 'বয়স তার চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তার উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।'৫৭ স্বভাবে তিনি ছিলেন স্বল্পবাক, বিনয়টা তার অজস্র নয়, অথচ ব্যবহারটা নিতান্ত ঠান্ডা। ধীরস্থির প্রাজ্ঞ শম্ভুনাথবাবুর স্পষ্টবাদিতা, দৃঢ়তা কল্যাণীকে প্রভাবিত করেছিল প্রবলভাবে। আর পিতা-কন্যা উভয়ের যে বৈশিষ্ট্য তাদের স্বাতন্ত্র্য দান করেছে,তা হচ্ছে তেজদীপ্ত সাবলীল ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের 'তেজ'৫৮ পরবর্তীতে 'সোহিনী' চরিত্রের মধ্যে আরও প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যাবে।

গল্পের দুটি অংশ। প্রথম অংশে কল্যাণী প্রথাগত সামাজিকতার ধারায় বয়স, পণের অঙ্ক এবং যৌতুকের মান এবং মূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে লাঞ্ছিত হয়েছে। কন্যার বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এ লাঞ্ছনার জবাব শম্ভুনাথবাবুও যথাযথভাবেই দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নায়ক অনুপম ছিল পুরোমাত্রায় নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয় অংশে অনুপম নিজের নিষ্ক্রিয়তায় মানসিকভাবে অনুতাপ করেছে। কল্যাণীকে ঘিরে রোমান্টিক ভাবনায় সে ডুবে থেকেছে। পরবর্তীতে যখন তার সাথে দেখা হয়েছে সে বিমুগ্ধ হয়েছে কল্যাণীর ব্যক্তিত্ব ও সহজ সৌন্দর্যে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, ক্ষমা চেয়েছে,কল্যাণীর সহকর্মী হবার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু কল্যাণী তাকে গ্রহণ করেনি নিজের জীবনে। নারী-শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে সে তখন মাতৃভূমির কল্যাণে নিয়োজিত করেছে নিজেকে। নিজের শিক্ষা, মেধাকে কর্মময় জীবনে প্রতিফলিত করে জীবনের স্বতন্ত্র সার্থকতাকে অন্বেষণ করেছে।

নর-নারী সম্পর্কের সূত্র ধরে অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার বিপরীতে এখানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র্যমন্ডিত নারী কল্যাণী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও বাংলা, ইংরেজী এবং হিন্দি ভাষায় অবলীলায় আলপচারিতার মধ্যে দিয়ে তার সুশিক্ষা এবং স্বশিক্ষার পরিচয় মেলে। কল্যাণীর প্রাণবন্ত বাচনভঙ্গি, উদার ও কল্যাণকামী মানসিকতার পরিচয় পেয়ে অনুপম মুগ্ধ। বস্তুত কল্যাণী তার 'মনের মধ্যে একটি অখন্ড আনন্দের ছবি'৫৯ হয়ে বিরাজ করেছে এভাবে: 'মেয়েটির বয়স ষোল কি সতের হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুকুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ,দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোন জায়গায় কিছু জড়িমা নাই। ------- মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণেভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ওঠে।'৬০ কল্যাণীর এই প্রাণময়তার মধ্যে অনুপম আবিষ্কার করেছে কোন সৌন্দর্যময়ী নারীকে নয়, একজন সত্যিকার মানুষকে।। কল্যাণীর 'আপনারা আমাদের গাড়ীতে আসুন না---এখানে জায়গা আছে।' ৬১-এই আহবানের মধ্যে অনুপম অনুভব করেছে অনির্বচনীয় প্রশান্তি :

> 'মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলেনা, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই'।৬২

এইভাবে অনুপম কল্যাণীকে কেবল নারী হিসেবে নয় বরং একজন মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করতে পেরেছে। যে মানুষ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে, মানুষের কল্যাণে ব্রতী হয়, সেই-ই তো কল্যাণী। কল্যাণীকে জীবন সঙ্গিনী করতে পারেনি বলে অবশেষে নিজেই কল্যাণীর পাশে জায়গা করে নিতে চেষ্টা করেছে।

তপস্বিনী

তৃতীয় পর্বের গল্পের আলোচনায় ক্রমশঃ যে ব্যক্তিত্বময় নারীর উদ্ভাসন লক্ষ্য করছি তা থেকে 'তপস্বিনী'-র (১৩২৪) 'ষোড়শী' সম্পূর্ণ ভিন্ন। তথাপি অসম দাম্পত্য জীবনের নিঃসঙ্গতা, ষোড়শীর জৈবিক অচরিতার্থতাজনিত হৃদয়-বেদনা, বঞ্চিত জীবনের হাহাকার গল্পটিকে দান করেছে আধুনিক শিল্পমূল্য। গল্পের নামকরণ থেকে অনুমান করা যায় যে এর কেন্দ্রীয় চরিত্র ষোড়শী। গল্পের সমাপ্তিতে সূক্ষ্ম কৌতুক ও হাস্যরসের অবতারণা করে তার আবরণে ষোড়শীর অন্তর্জ্বালাকে তির্যকভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

পর পর তিনবার বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বরদা যখন গৃহত্যাগ করে ষোড়শী তখন ত্রয়োদশী। তাদের দাম্পত্য জীবনের রূপ কী ছিল, গল্পে তার উল্লেখ নেই। তবে অপরিণত বয়সের কারণে 'তার সামনেই বরদার চরিত্র সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্যন্ত বাধিত না'। ৬৩ ষোড়শী স্বল্প বয়স এবং অভিজ্ঞতা দিয়েও উপলব্ধি করতে পারে স্বামীর অকর্মণ্যতা, অকৃতকার্যতা। মূলত ঃ এখান থেকেই ষোড়শীর অর্ন্তজ্বালার সূত্রপাত। বাড়ির সকলের কাছে তার মাথা হেঁট হয়, স্বামীর সমালোচনা শুনতে হয় অথচ প্রতিবাদ করতে পারেনা। এই পরিস্থিতিতে বরদা যখন গৃহত্যাগ করে, ষোড়শী-একপ্রকার সান্ত্বনা লাভ করে। 'তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসার-সুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল'।৬৪ এইভাবে

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শী যখন যৌবনে পদার্পণ করেছে, তখন সে ক্রমে উপলব্ধি করতে পেরেছে স্বামী বিচ্ছেদের শূণ্যতা। বলা যায়, ষোড়শীর অন্তর্জ্বালার সূত্রপাত এখান থেকেই। স্বামী-বিচ্ছেদে কাতরা ষোড়শীর মানসিক অবস্থা এখানে বৈষ্ণবীয় রাধা -চরিত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে :

> 'ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারিদিকে যেন আটিয়া ধরে,তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আলনাটা, আল্‌মারিটা-তার জীবনের শূণ্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।
>
> সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সবচেয় আপন। কেননা, তার 'ঘর হইল বাহির,বাহির হইল ঘর।'৬৫

এইভাবে ষোড়শী শ্বশুরালয়ে সকলের মধ্যে থেকেও একা হয়েছে, একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে নির্মাণ করেছে নিজস্ব ভুবন। কিন্তু তাতেও মুক্তি মেলেনি তার। বরং বিরহ যাতনা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর সেই সাথে মনের অগোচরেই শুরু হয়েছে তার প্রতীক্ষার প্রহর গোনা। 'সহেনা যাতনা/দিবস গনিয়া গনিয়া বিরলে/ নিশিদিন বসে আছি শুধু পথ পানে চেয়ে/ সখা হে, এলে না/'৬৬ এইরূপ তীব্র প্রতীক্ষার পর পতি বিচ্ছেদের অবসানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু হয়েছে তার সন্ন্যাসী-সেবা, কৃচ্ছসাধন-চর্যা। বাড়ীতে সন্ন্যাসী সেবার জন্য অতিথিশালা, ভোজের আয়োজন প্রভৃতি কর্মের মধ্যে দিয়ে মূলতঃ ষোড়শী স্বামীকেই অন্বেষণ করে ফিরেছে। 'এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবন যৌবনের পরিপূর্ণতা।'৬৭ এইভাবে যৌবনের সূচনালগ্ন থেকেই ষোড়শীর স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা, অন্বেষণ কেবল যেন 'প্রত্যাশার প্রদীপ'৬৮ জ্বালিয়ে রাখে। বরদার অকর্মণ্যতা, অকৃতকার্যতার মনোবেদনা ক্রমশঃ পতি বিচ্ছেদজনিত বিরহ বেদনায় পর্যবসিত হলো। এ বেদনা থেকে মুক্তি পেতে মানসিক সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেছে সে সন্ন্যাসব্রত চর্যার মধ্যে দিয়ে। সকলে তার কৃচ্ছসাধনে ধন্য ধন্য করলেও ষোড়শী একাজটি করেছে সচেতনভাবেই। জৈবিক অচরিতার্থতাজনিত হাহাকারকে সে প্রতিরোধ করতে পারেনি কিছুতেই। গল্পে তার প্রমাণ মিলবে :

> 'কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত । তার মনের রঙ তো তার গায়ের তসরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ-যে ঝির্-ঝির্ করিয়া ঠান্ডা হাওয়া দিতেছিল, সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন্ একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পৌঁছিল। -------- এক একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ করে সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পন্ডিত মশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়, অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালী খস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদুর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল,ক্ষণে ক্ষণে পুকুর পাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই-সমস্তই তার

Dhaka University Institutional Repository

মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না।' ৬৯

---- এইভাবে স্বামীর জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ষোড়শী। ক্রমে দেখা দেয় তার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। বরদা চলে যাবার পর দীর্ঘ বারো বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে; ষোড়শী পঁচিশ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা ষোড়শীকে জটিল যন্ত্রণাময় আর্বতে ফেলে দেয়। অচরিতার্থতাজনিত ব্যাকুলতা ক্রমেই তাকে করে তোলে বিকারগ্রস্ত। কৃচ্ছসাধন, প্রাণায়াম অভ্যাস, শ্বশুরের সম্পত্তি থেকে শুরু করে নিজের গহনা পর্যন্ত দান করে সন্ন্যাসী-সভ্যদের পথ অনুসরণ করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে যোগী শিক্ষকের কথায় আয়নার মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে সে দেখতে পায় বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে ধ্যানমগ্ন। সেখানথেকে তার তপস্যার তেজ এসে ষোড়শীকে স্পর্শ করছে। বলা বাহুল্য, এই লক্ষণ বিকারগ্রস্ত ষোড়শীর 'হ্যালুসিনেশন' ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলত দীর্ঘ বঞ্চনায় কেঁদে ওঠে ষোড়শীর 'আদিম অকম্পিত জীবাত্মা'৭০ যার অনিবার্য পরিণতিতে সে নিক্ষিপ্ত হয় মানসিক বিকারগ্রস্ততায়। গল্পে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে :

> 'যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ-পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল, যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক পূর্বের সৃষ্টি, যার রঙের সঙ্গে ধ্বনির সঙ্গে গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে, তারই ছোট বড়ো হাজার হাজার দূত জীব হৃদয়ের খাস্‌মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে-ষোড়শী তো কৃচ্ছসাধনের কাঁটা গড়িয়া আজও সে পথ বন্ধ করিতে পারিলনা।' ৭১

গল্পের শেষে যোগী শিক্ষকের সকল কারসাজিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়ে বরদা আমেরিকার কাপড় কাচা কল কোম্পানীর ভ্রমণকারী এজেন্ট হয়ে আবির্ভূত হয়ে হাস্যরস মিশ্রিত চমক সৃষ্টি করেছে বটে কিন্তু তপস্বিনী ষোড়শীর তপস্যার অন্তরালে যে না-পাওয়ার হাহাকার, বঞ্চনা, অন্তর্জ্বালার পরিচয় মেলে তা এই কৌতুকের স্রোতে মলিন হয় না মোটেই। বরং তাকে ছাপিয়ে বঞ্চিত এক নারীর হৃদয়-বেদনার ইতিহাসটি পাঠকের মনে মোটা দাগে অঙ্কিত হয়।

পয়লা নম্বর

গল্পগুচ্ছে সন্নিবেশিত ব্যক্তিত্বময় ও স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত নারী চরিত্রের মধ্যে 'পয়লা নম্বর' (১৯১৭) এর অনিলা নানা দিক দিয়ে বিশিষ্ট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯১৪) সময়ের অনিবার্য বাক্তিত্ব, চরিত্রের দৃঢ়তা, অবহেলিত, লাঞ্ছিত উন্মূলিত জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে ভীত, চিন্তা-সংকুল পরিস্থিতিতে নিজের স্বতন্ত্র পথ সগর্বে ঘোষণা অনিলাকে পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক করেছে। তবে আত্মজাগরণ এবং আত্মমুক্তির গল্পের ধারায় 'পয়লা নম্বর' নানা কারণে ভিন্নধর্মী। 'নারী তার অপমান,লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, আর উপেক্ষার জন্য সরাসরি অভিযুক্ত করেছে পুরুষকে এবং সেই সাথে পুরুষশাসিত সমাজকে। পুরুষের চরম

Dhaka University Institutional Repository

অবমাননার বিপরীতে পুঞ্জীভূত হয়েছে নারীর ক্ষোভ, দ্রোহ, মুক্তিকামিতা। এক্ষেত্রে নারী নিজেকে সংকীর্ণ অর্থে নয় ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির দাবীতে নিজেকে স্বনিরূপিত পথে পরিচালিত করেছে। কিন্তু 'পয়লা নম্বর'গল্পে পুরুষের আত্মভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারীর মূল্য। খনিগর্ভের অনাবিষ্কৃত হীরকখন্ডের মত সম্ভাবনাদীপ্ত নারী অনিলাকে সত্যস্বরূপে আবিষ্কার করেছে যে, সে পুরুষ,সিতাংশুমৌলি। আর আবিষ্কৃত অনিলার হীরকদ্যুতি যখন বিচ্ছুরিত হয়েছে, তখন স্বীকারোক্তিমূলক আত্মবেদনায় অনিলা-প্রশস্তির শব্দগাথা যে প্রণয়ন করেছে, সেও পুরুষ, অদ্বৈতচরণ।'৭২ গল্পে সিতাংশুমৌলি বাইরের মানুষ হয়েও 'পরম বিস্ময়ের ধন অনির্বচনীয়'৭৩ অনিলাকে আবিষ্কার করেছে নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে। নীরবে নিভৃতে সে তার মহিমাকে 'পূজা' করেছে 'শ্রদ্ধা' করেছে। কিন্তু অদ্বৈতচরণ তার গৃহকোণের সবচেয়ের কাছের মানুষটি হয়েও অনিলাকে নিছক স্ত্রী হিসেবেই মূল্যায়ন করছে। জীবনসঙ্গী হয়েও অনিলার কর্তব্য কর্ম, আনন্দ, বেদনার সহমর্মী হতে পারেনি সে। সংসার এবং অনিলা এ দুয়ের প্রতি তার চরম উদাসীনতা এ নর-নারীর মধ্যে কেবল দূরত্বই বাড়িয়েছে একটি পর্যায়ে অনিলা গ্রহণ করেছে স্বনির্বাচিত নৈঃসঙ্গের পথ। আর তাকে হারিয়ে অনিবার্যভাবে নিঃসঙ্গ হয়েছে অদ্বৈতচরণ। 'জ্ঞানচর্চায় এবং আত্মম্ভরিতায়'৭৪ মগ্ন থাকাতে অনিলা তাকে বর্জন করেছে। তখন অদ্বৈতচরণের উপলব্ধি; 'হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্য কালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল।'৭৫ অতঃপর নিজের অপরাধবোধ উত্থিত চেতনায় সে স্বীকার করে 'পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করব'র মূল্য আমি কিছুই দিইনি।'৭৬ আট বছরের সংসার জীবনে অনিলা তার কাছে থেকে গেছে অনাবিষ্কৃত, অচেনা, অদেখা। প্রতিবেশী সিতাংশুমৌলি আবির্ভূত হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে যে ভাবে অনুরাগে, বেদনায় অনিলাকে আবিষ্কার করেছে, অনুভব করেছে, অদ্বৈতচরণের কাছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি দুঃখজনক হয়ে উঠেছে :

> ''কিন্তু এ কী আশ্চর্য। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্টতার পর এই পরের চিঠিগুলোর ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। -------- যাকে আমি কোনো দিনই দেখিনি, এক নিমেষের জন্যও পাইনি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।''৭৭

সিতাংশুমৌলিকে অদ্বৈতচরণ ঈর্ষা করেছে, উপেক্ষাও করতে চেয়েছে, কিন্তু পরিশেষে অকপটে স্বীকার করেছে 'সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল-ওগুলি আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।'৭৮ এইভাবে অদ্বৈতচরণ অনিলার মহিমাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। 'অনিলাকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্য'৭৯ অস্থির হয়েছে। পক্ষান্তরে সিতাংশু অনিলাকে যেভাবে দেখেছে তা যেন সৃষ্টির আনন্দে উদ্ভাসিত। কামনা কিংবা প্রাপ্তির প্রত্যাশা এখানে অবান্তর প্রশ্ন। তাকে ছাপিয়ে স্বর্গীয় শাশ্বত মহিমা আবিষ্কারের আনন্দে যেন তার 'নবজাগরণ' ঘটেছে। প্রশান্তি আর প্রশস্তি বন্দনায় সে রোমাঞ্চিত হয়েছে, এক প্রকার তৃপ্তিও লাভ করছে সে :

Dhaka University Institutional Repository

> ''আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে-আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই।''৮০

সিতাংশুমৌলির স্তবে অনিলার যেন নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। আত্মজাগরণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে চিনেছে সে। অদ্বৈতচরণের উপেক্ষা ,অনাদর নির্বিচারে গ্রহণের প্রস্তুতি আর নেই। কিন্তু সরব প্রতিবাদ নয় নীরবে আত্মমুক্তির পথে অন্তর্ধান করেছে সে। স্বামী অদ্বৈতচরণের সংসার পরিত্যাগ করেছে,সিতাংশুমৌলিকেও প্রত্যাখান করেছে। যাবার প্রক্কালে উভয়কেই নীল রঙের এক টুকরো কাগজের দুটো খন্ডে লিখে গেছে তার বক্তব্য 'আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করোনা। করলেও খোঁজ পাবেনা।' ৮১ এ গল্পে অনিলা নিখোঁজ হয়েছে, কিন্তু মৃণালের মতো গৃহত্যাগ করে জগদীশ্বরের কাছে যায়নি। *গল্পগুচ্ছের* এ পর্যায়ে এসে এভাবে আমরা রবীন্দ্রনাথের আরেক উত্তরণ দেখতে পাই।

অনিলার প্রত্যাখান পত্র পাবার পরও সিতাংশুমৌলি অনিলা-বিমুখ হয়নি। বরং তার সে পত্রখানি সযত্নে 'এনামেল-করা সোনার কার্ড-কেস'৮২ এর মধ্যে সংরক্ষণ করেছে। 'এভাবেই অনিলার মধ্যে প্রথম সামাজিক প্রেয়সীমূর্তির পূর্ণায়ত গৌরব ও মহিমা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শিল্পসাফল্য পেল'। ৮৩ সিতাংশুমৌলির কাছে অনিলা কামনার বস্তু বিশেষ নয়, 'প্রেয়সী'। অনিলাকে পাবেনা জেনেও হৃদয়ের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মনোযোগ অনিলার দিকেই শেষ পর্যন্ত অটুট থেকেছে। পরস্ত্রী অনিলার ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরক্তি অনিলাকে প্রেয়সীর মর্যাদাদানে সিতাংশুমৌলিকে উদ্বোধিত করেছে।

রবিবার

জগৎজীবন ও সমাজ-সময়ের চলমানতায় সতত নিরীক্ষাপ্রিয় রবীন্দ্র-প্রতিভা গল্পগুচ্ছের প্রান্তপর্বের দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমেই যেন বিকিরণ করেছে হীরকোজ্জ্বল দ্যুতি।যেমন চরিত্র নিয়ে, তেমনি ভাব, ভাষা, প্রকরণকৌশল সবখানেই তাঁর নিরীক্ষাপ্রিয় স্বভাবটি ক্রমশঃ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'রবিবার'(১৯৩৯) গল্পটি এ ধারায় যুক্ত করেছে আরেক নবতর মাত্রা। অভীক-বিভার এ গল্প পাঠ অন্তে ভাষার শাণিত ধারাটি যেমন চোখে পড়ে তেমনি চরিত্রগুলোর দিকে তাকালেও 'শেষের কবিতা'(১৯২৯)-র কথা মনে পড়ে যায় অনিবার্যভাবেই। আবার অভীক-চরিত্রের গভীরে 'গোরা'(১৯১০)র গৌরমহনের ছায়াও লক্ষ্য করা যবে কখনো কখনো। আলোচনার শুরুতে অভীকের চেহারাটা স্মরণ করা যাক :

> ''অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুকেছে যন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণি-পীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শতহস্ত দূরে বর্জনীয় বলে গণ্য করত।'' ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

নায়কের নামকরণের মধ্যেই তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যটি লুকানো আছে। 'তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল করে করলে অভীককুমার। তাছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নমুনার মানুষও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে। ৮৫

যন্ত্রবিদ ও চিত্রশিল্পী হিসেবে অভীকের পরিচিতি থাকলেও নাস্তিকতা তার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ধনী আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও গৃহদেবতাকে অস্বীকার করেছে সে। ফলে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে তাকে। কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছে সে সানন্দে, কিন্তু প্রথাগত যে কোন ধারণার বিরুদ্ধে তার মত প্রকাশ করেছে সে সর্দপে। বিভা তার বন্ধু। 'কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। অভীকের বয়স তখন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্ ঝক্ করছে, আর তার নেতৃত্ব বড়ো বয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।'৮৬ গুণী চিত্রশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা ছিল তার লালিত স্বপ্ন। বিভার কাছে প্রত্যাশা করেছে সে তার স্বীকৃতি। কিন্তু বিভা অভীকের ছবির মর্মার্থ বুঝতে পারেনা। তা সত্ত্বেও অভীকের হৃদয়ের ভালোবাসা বিভার জন্য। অভীকের চোখে বিভা ছিল 'অনাহুতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'। সে তাকে বলে 'কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইসক্রুটেবল।'৮৭ প্রচুর মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে থেকেও এভাবে অভীক বিভার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এক শৈল্পিক সৌন্দর্য। বিভাকে জীবনে পেতে চেয়েছে অভীক। কিন্তু বিভা তাকে গ্রহণ করেনি। অভীকের প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা থাকলেও কখনো তা প্রকাশ করেনি সে। অভীক বার বার এসেছে বিভার কাছে, কিন্তু বিভা ছিল নির্লিপ্ত । অথচ বিভার অন্তরের টান অভীককেই আকর্ষণ করত সবসময়। অভীকের প্রতি বিভার এই দুর্বলতা প্রকাশ পেল তখন, অভীক যখন জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছে বিলেতের পথে।

> 'কিছুকাল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায়নি। বিভার মুখ শুকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে ঘুলিয়ে, কী হয়েছে, কীহতে পারে,তার ঠিক পাচ্ছে না। দিনগুলো যাচ্ছে পাঁজর -ভেঙে দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে অভীক ওর উপরই অভিমান করে চলে গেছে, ওর ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই , উধাও হয়ে চলে গেল- ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেবনা''। অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর বিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর চক্ষু বেয়ে কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্কার দিলে।'৮৮

এই ক্রন্দন অভীকের প্রতি বিভার পবিত্র ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। অভীকের জন্য হৃদয় শোকার্ত হলেও তাকে জীবনে গ্রহণ করেনি বিভা। 'রূপে নয়, লাবণ্যে বুদ্ধি ও শিক্ষায়, সংযমে ও আত্মত্যাগে

Dhaka University Institutional Repository

বিভা যেন 'শেষের কবিতার'লাবণ্য , আর অভীক ঐ গ্রন্থেরই অমিত; সমস্যা; গল্প সংস্থানও প্রায় এক। --------- কিন্তু এত কিছুর পরেও এত কিছুর মধ্যেও বিভার শ্রদ্ধা ও আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র অনাত্র সে ব্যক্তিটি আর একটি শোভনলাল তাহার নাম অমর বাবু।' ৮৯

অমর বাবু দরিদ্র এবং মেধাবী। গণিত শাস্ত্রে তার দক্ষতার কারণে কোপেনহেগেনে সর্বজাতির ম্যাথামেটিক্স কনফারেন্সে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এসেছে তার। বিভা মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী -গয়না বিক্রি করে সে টাকা অমরবাবুকে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। এই ঘটনা থেকেই বলা যায় অভীক উপলব্ধি করতে পেরেছে যে তাকে সরে যেতে হবে। তবে বিভার অলঙ্কার বিক্রির সিদ্ধান্তকে সে মেনে নিতে পারেনা কোনমতেই। তাই একটা 'ক্রিমিনাল পূণ্যকর্ম', ৯০ করে নগদ পাঁচ হাজার টাকা অমরবাবুর জন্য দান করে। আর বিভার চুনি-মুক্তোয় মেশানো হারখানি স্মৃতিস্বরূপ চুরি করে যাত্রা করে বিলেতের উদ্দেশ্যে। আর বিভাকে উপহার দিয়েছে অভীকের হাতে আঁকা ছবি। বিভা অভীকের মাঝখানে অমরবাবু তৃতীয় চরিত্র হয়েছে কিন্তু বিভার প্রত্যাখ্যান অভীকের মনকে টলাতে পারে একটুও। বিভার হার বিক্রির সিদ্ধান্ত তার কাছে 'পাঁজর ভেঙ্গে সিঁধ কাটতে'৯১ যাওয়ার মতো। বলা যায়, অমরবাবুর জন্য বিভা গচ্ছিত মাতৃ-অলঙ্কার বিক্রি করবে এই-ঘটনা অভীকের মনে ধাক্কা দিল প্রবল ভাবে, যেন সুপ্তোত্থিত অভীক চৈতন্য ফিরে পেল। মুহূর্তের মধ্যেই বিভাকে বুঝতে বাকী থাকেনা তার। তাই তার জীবনের সিদ্ধান্ত সে নিয়ে নিল হঠাৎ, অনেকটা সংগোপনে। বিভাকে সে বর্জন করেনি, বরং বিভার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে পরম ভালোবাসায়, শিল্পী মনের গভীরে যার ব্যাপ্তি :

> 'বী আমার মধুকরী, জগতে সবচেয়ে ভালেবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্যভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব - তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস সমস্ত চোখ বুঝে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনও না ঘটে। তোমার কাছে থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে,. যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে-আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।' ৯২

---- এইভাবে বিভা-অভীক দুজনে দুজনকে জীবনে গ্রহণ না করেও প্রেমের মহত্ত্বকে অক্ষুন্ন রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ কথা

জীবনের প্রান্ত পর্বে এসে নর-নারী সম্পর্ক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসর বোধের পরিচয় আমাদেরকে অভিভূত করে,বিস্মিত করে । নর-নারী সম্পর্ক কেবল প্রেম কিংবা অপ্রেমেই সীমাবদ্ধ নয়, কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রতিষ্ঠার পেছনে নারী কিংবা পুরুষের যে ভূমিকা ক্রিয়াশীল, তারই দর্শনমন্ডিত দৃষ্টান্ত 'শেষ কথা'। *গল্পগুচ্ছে,* নারী চরিত্রের ক্রম-উজ্জ্বলতার প্রসঙ্গ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে পুন পুন। প্রান্ত পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার নান্দনিকতা এ গল্পে স্থিতি লাভ করেছে। মহৎ সৃজনশীলতার অর্ধেক কৃতিত্ব নারীর, এ সত্য এপর্বে প্রতিষ্ঠিত হলো। রবীন্দ্র-নারী ভাবনায় অচিরা তাই কল্যাণময়ী এক নারী মডেল। নর-নারী সম্পর্ক এ পর্বে এসে হয়ে উঠেছে সত্যানুসন্ধানী।

নায়ক নবীবমাধবের কড়া স্বভাব। 'পাথরের সিন্ধুকে'৯৩ আঁটা তার সংকল্প। কর্মযোগী নায়ক কর্মের *নেশায়* বুঁদ হয়ে জীবনের সমস্ত মনোহরের 'দরজা' কে পাশ কাটিয়ে উপেক্ষা করেছে। হঠাৎ এক 'চরমের সংস্পর্শে'৯৪ যেন তার মনের 'ছিটকিনি' অবারিত হলো। গল্প থেকে তার 'অপূর্ব স্বরূপ'৯৫ উদ্ধার করা যাক :

> ''সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনে সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙগনার -গাঠ-ছেড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একিট ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্ণিমার বান ডেকে আসার মতো বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ। ৯৬]

'কুসমিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে' ৯৭ অচিরাকে প্রথম দর্শনেই নায়ক নবীনমাধব মুগ্ধ। তার রোমান্টিক দৃষ্টি কেবল অচিরার বহির্জাগতিক সৌন্দর্যই দেখেনি; বরং অচিরার মনোজাগতিক সৌন্দর্যের পরিচয়ে নায়ক অভিভূত, বিমুগ্ধ। অচিরার ভেতরে ও বাইরের সম্মিলিত সৌন্দর্যের মধ্যে নায়ক নবীনমাধব স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান পেয়েছে। খনি আবিষ্কারের তপস্যায় ব্রতী নায়ক যেন হঠাৎ করেই 'সোনার খনির খবর' পেয়ে গেছে। তার কাছে অচিরার রূপ এবং বুদ্ধি যুগলমূল্যে অনন্য হয়ে উঠেছে। যেন স্বয়ং সরস্বতী'৯৮ নীচের বাক্যগুলি থেকে তা অনুমান করা যাবে:

ক. '' এর পূর্বে বাঙ্গালী মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সবকিছু থেকে স্বতন্ত্রভাবে এমন একান্ত করে তাকে দেখবার সুযোগ পাইনি। এখানে তার শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। বিদেশিনী রূপসী তো অনেক দেখেছি, যথোচিত ভালোও লেগেছে। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে এই যেন প্রথম দেখলুম, ঠিক যে জায়গায় তাকে সম্পূর্ন দেখা যেতে পারে'' ৯৯

খ. এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা কওয়া বিপদজনক। ১০০

গ. নির্মল আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে। ১০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির সুগভীর সম্মোহনী-ক্ষমতায় যদিও অচিরা -নবীনমাধব পরস্পর আকৃষ্ট হয়েছে, তথাপি নিজের বোধ- -বিবেচনা, অবস্থান সম্পর্কে অচিরার সচেতনতা আর অবিচলতা তার কল্যাণময়ী গুণকেই নির্দেশিত করে। অচিরার সিদ্ধান্ত নবীনমাধবের সাধনার পথকে প্রকারান্তরে প্রশস্ততর করে তোলে। অরণ্যের মোহময়তা আর প্রেমের অন্ধশক্তিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় সে তার সত্যসন্ধ উপলব্ধিতে। তাই সে নবীনমাধবকে বলতে পারে: ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কামনার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।''১০২ অচিরা বুঝতে পারে তার প্রতি ভালোবাসার কারণে নবীনমাধবের গবেষণা, সাধনা বিঘ্নিত হচ্ছে। সে কথা নবীনমাধবও স্বীকার করে। 'আমার বৈজ্ঞানিক খবরকে ছাড়িয়ে উঠলে, এঁদের খবর নেওয়া'। অচিরার প্রতি মোহ নায়কের কর্মতৎপরতার ব্যাঘাতের কারণ, এসত্য অচিরাও যেমন উপলব্ধি করেছে, নবীনমাধবেরও অজানা নয়। এ প্রসঙ্গে তার আত্মোপলব্ধ :

> ''চিত্তাচাঞ্চল্যে কাজের বাধা এমনি ঘটছে যে আমি লজ্জা পাচ্ছি মনে মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে আমার রিচার্সবিভাগে আরও কিছু টাকা মঞ্জুর করে নেবার প্রস্তাব আছে। তারই সমর্থক রিপোর্ট অর্ধেকের বেশি লেখা হয়নি''।১০৩

'চিত্ত চাঞ্চল্য আর ভালোবাসার অমোঘ আর্কষণে নবীনমাধবের সাধনাবিচ্যুত মানস-চাঞ্চল্য অচিরার মধ্যে জন্ম দেয় এক ধরণের আত্মগ্লানির। এ গ্লানি অচিরাকে নিজ আর্দশ বিচ্যুত করবার আগেই সচেতন হয়েছে সে। নির্মল আত্মমর্যাদায় প্রত্যক্ষ উচ্চারণে নবীনমাধবকে তপস্যার পথে অগ্রসর হতে বলেছে। নিজেও প্রস্থান করেছে দ্রুত। নবীনের কর্মসাধনাকে তার মনে হয়েছে 'বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা',১০৪ এবং নবীনের প্রতি তার যে প্রেম, তা নিষ্কাম। 'এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনো দেখিনি। দূরে থেকে ভক্তি করেছি'।১০৫ মুলত নবীনের কর্মসাধনার পথে অন্তরায় ভেবে নিজের মধ্যে এক প্রকার অপরাধ বোধে অনুতপ্ত হয়েছে অচিরা। গল্পে তার প্রমাণ মেলে :

> ''আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হলো নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে! এইতো আপনার দিককার কথা, এখন আমার কথাটা বলি। আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি - যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল, তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিঃশ্বাসের ভিতর থেকে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে আসছে। তখনই বিছানা ফেলে ছুটে গিয়ে ঝরনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি স্নান করেছি''।১০৬

Dhaka University Institutional Repository

অচিরার সাধনা তার ভালোবাসায় অবিচল থাকা। তার সে ভালোবাসা ভবতোষকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছিল। তাই-ই বিবর্তিত হয়ে অচিরার কাছে হয়ে ওঠে 'সতীত্ব'।১০৭ তার অভিমত, 'সতীত্ব একটা আর্দশ। এ জিনিষটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আর্দশকে আমি পূজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না''।১০৮

বলাবাহুল্য, ভবতোষের প্রতারণা অচিরাকে নিঃসঙ্গ করেছে। ভবতোষকেও সে শ্রদ্ধা করতে পারেনা সে জন্য। কিন্তু তাকে আশ্রয় করে যে ভালোবাসার বিকাশ, তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারে না সে। অচিরার মতে, 'সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই'।১০৯ এগল্পে অচিরার আর্দশ তিনটি জায়গায় অচ্যুত থেকেছে। প্রথমত,তার প্রথম ভালোবাসা থেকে সে সরে আসতে চায়নি, দ্বিতীয়ত, নবীনমাধবের কর্মতপস্যার অগ্রযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায়নি। তৃতীয়ত,তার প্রেমে প্রত্যাখ্যানজনিত নৈঃসঙ্গ্য দূরীকরণে দাদুকেও কর্মস্থল থেকে সরিয়ে এনে কার্যত তাকে কর্মময়জীবন থেকে বঞ্চিত করতে চায়নি। এই তিনটি ক্ষেত্রেই নিজেকে চরম অপরাধী ভেবেছে সে। এ প্রসঙ্গে কচ-দেবযানী, ঋষাশৃঙ্গের সাধনা ভঙ্গের কথাও স্মরণ করেছে সে। আত্মগ্লানিতে লজ্জিত হয়েছে সে, নবীনমাধবকে মুক্তি দিয়েছে, নিজেও মুক্ত হয়েছে। নিবীনমাধবকে 'পা ছুঁয়ে প্রণামের' মধ্যে তা নিষ্কাম ভক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নবীনমাধবের মুক্তির স্বরূপ ভিন্ন। সেখানে একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনা সম্মিলিত। প্রতীকী অভিব্যঞ্জনায় গল্পের পরিসমাপ্তিতে তার পরিচয় পাই :

> ''বাড়ী ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল-বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হলো খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল নড়তে চড়তে সেটা বাজে''। ১১০

ল্যাবরেটরি

পুরো জীবনের সাহিত্য চর্চায় রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন, যারা ভিন্ন মতে, ভিন্ন পথে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে । *গল্পগুচ্ছেও* (১৮৯১-১৯৪০) এমন বিচিত্র পুরুষ এবং নারী চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটেছে। তবে যেহেতু *'গল্পগুচ্ছ'*-এর গল্পসমূহের রূপ এবং রূপান্তর এ গ্রন্থকে বিশিষ্ট করেছে, সেহেতু এর চরিত্রগুলোতেও রূপান্তর বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত। এ রূপ-রূপান্তরকে রবীন্দ্র-প্রতিভার একেকটি উৎকর্ষ- সোপান বলা যেতে পারে। প্রান্তপর্বে এসে নর-নারী সম্পর্কের সূত্রে ক্রমশঃ যেন চরিত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সুর বেজে উঠেছে অনিবার্যভাবেই। নারী ক্রমশঃ স্বতন্ত্র এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য এদের মধ্যে পুরুষচরিত্র যে অনালোকিত থেকেছে, এমন বলা যাবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

রাইচরণ, ভূপতি, বনোয়ারি, অভীক, নন্দকিশোর -এরা প্রত্যেকে *গল্পগুচ্ছের* পুরুষ চরিত্রদের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করবার মতো যোগ্যতায় সমুজ্জ্বল। তবে গল্পের রূপান্তর লক্ষ্য করলে তুলানামূলকভাবে দেখা যাবে নারী চরিত্র সমূহের ক্রমবিকাশ ক্রমশঃ গতিশীল এবং সাফল্যস্পর্শী হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষের পাশে থেকে নারী কখন যেন সরে যেতে শুরু করেছে, স্বতন্ত্র ভাবনায় হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বময়ী। প্রথম পর্বের (১৮৯১-১৯০০) কনকচাঁপা, মহামায়া, হরসুন্দরী, চন্দরার অতৃপ্তি, বেদনা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, সম্প্রসারিত হয়েছে দ্বিতীয় পর্বের (১৯০১-১৯১৩) চারুলতার মধ্যে। অচরিতার্থজনিত আসক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্তর দহনে যার মর্মস্পর্শী প্রকাশ। তারই উত্তরসূরি হিসেবে তৃতীয় পর্বের (১৯১৪-১৯৪০) আনন্দী -মৃণাল-অনিলার আত্মপ্রকাশ। পুরুষের শাসন, শোষণ, অপমান উপেক্ষা -জর্জরিত জীবনকে সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে যারা নির্বাচন করেছে নিজস্ব গতিপথ। যে পথের শেষ মাইলস্টোন হিসেবে সর্দপে, একাকী দাঁড়িয়ে আছে বিজয়িনী সোহিনী।

'ল্যাবরেটরি' (১৯৪০) গল্পের নন্দকিশোর-সোহিনী সম্ভবত এ গ্রন্থের একমাত্র জুটি যেখানে পুরুষ এবং নারী উভয়ই চিন্তনে, মননে, ব্যক্তিত্বে কালকে অতিক্রম করতে পেরেছে, কর্মে হয়ে উঠেছে যুগোপযোগী। তবে এগল্পের প্রধান নারী চরিত্র সোহিনী। কেবল এ গল্পের নয় বরং সমগ্র *গল্পগুচ্ছের* মধ্যে সে অনন্য। তার অবয়বে এর আভাস মিলবে; পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। ---- 'জ্বল জ্বলে তার চোখ-ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শাণ দেওয়া ছুরির মতো'।১১১ বিশ বছর বয়সে নন্দকিশোরের জীবনসঙ্গী হয় এই পাঞ্জাবী কন্যা সোহিনী। লন্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা 'ব্রিলিয়ান্ট' এঞ্জিনিয়ার নন্দকিশোর মনের কষ্টি পাথরে সোহিনীকে আবিষ্কার করেছে। যদিও সোহিনী স্থূলিতা, তথাপি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 'মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেকটরের তেজ'।১১২ সোহিনীর সংকোচহীনতা, চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা মুগ্ধ করেছিল তাকে। দৈহিক শুচিতা নয় মানসিক শুচিতাই নন্দকিশোরের কাছে বড় ছিল। সোহিনীও ঠিক এই মন্ত্রেই বিশ্বাসী ছিল। মন্মথ চৌধুরীর কাছে তাই সে বলে :

> ''আমার শুকনো পাঞ্জাবী মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেঈমানী করতে পারব না।
> ---------- আমাকে যিনি বেছে এনছিলেন তিনি ভুল করেননি''। ১১৩

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে নন্দকিশোরের মৃত্যু হলে সোহিনী ভেঙ্গে পড়েনি মোটেই। 'একমুখী পতিভক্তি বা স্মৃতিলালিত বৈধব্যে প্রেমের মুক্তি -এই দুর্মর সামাজিক সংস্কারে তার অনাস্থা ছিল'।১১৪ বরং যৌবনকে অস্বীকার করেনি সে। শারীরিক শুদ্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে সামনের দিকে এগিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে সে প্রবল উদ্যমে। কিন্তু নিজের আদর্শ, নীতি, কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি কোন ভাবে। বরং উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে নিজের শরীরকেও সে ব্যবহার করেছে অসংকোচে। নারীর মোহজাল বিস্তার করে একে একে স্বার্থসিদ্ধি করেছে সে দারুণ নৈপুণ্যে, স্বামীর রেখে যাওয়া ল্যাবরেটরি আর টাকা -দুটোকেই সযত্নে সংরক্ষণ করেছে সে। এ ব্যাপারে করো সাথে, এমনকি তার আত্মজা-নীলার সাথে পর্যন্ত কোন রকম আপোষ করেনি সে। আম্বালায় অসুস্থ আইমাকে দেখতে যাবার পূর্বে নিজ কোমরবন্ধে সুরক্ষিত ছুরি দেখিয়ে কন্যাকে বলেছে, 'এই ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে'। ১১৫ দৈহিক শুদ্ধতা সম্পর্কে তার স্বীকাররোক্তি :

> ''মন যে লোভী-মাংসসজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধেনা। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তিদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। ------ ছেলে বেলা থেকে ভালমন্দবোধ আমার স্পষ্ট ছিলনা। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেননি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি।' ১১৬

জীবন যৌবনের উদ্দামতায় সুকৌশলী সোহিনী -অবগাহন করেছে। বিশ্বাস করেছে সতীত্ব নয়, কর্মের মধ্যেই মানুষের সার্থক বেঁচে থাকা, কর্মেই মুক্তি। স্বামী নন্দকিশোরও তাকে কেবল গৃহিণী না ভেবে বরং তাকে দীক্ষা দিয়েছে কর্মমন্ত্রের, তাকে সৃষ্টি করেছে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে-নারী নয় কর্মময় মানুষ হিসেবে প্রস্তুত হয়েছে সোহিনী। তাই স্বামীর প্রতি ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায় অবনত সোহিনী হৃদয় মন্দিরে তার আর্দশকে অক্ষত রাখতে চেয়েছে। স্বামীর সৃষ্ট ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ করেছে পবিত্র বেদি, যেখানে নন্দকিশোরের মূর্তি সযত্নে স্থাপিত,ধুপধুনো জ্বলছে, ফুলে ভরে আছে থালা। স্বামীর মহানুভবতার কথা সে নিঃসংকোচে স্বীকার করেছে এত স্খলনের মাঝেও :

> 'পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নীচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন-পাশে বললে মিথ্যে হবে,তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়ে--জামাইয়ের গুমর-বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রক্ত ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি।' ১১৭

বস্তুত এখান থেকে শুরু সোহিনীর অবিচল কর্মনিষ্ঠার। স্বামীর ল্যাবরেটরিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তার কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা। মূলত কর্মই সোহিনীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তার উদ্দামতা সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান হয়ে ওঠেনি। সততা, সাহস, নীতি আর আত্মবিশ্বাসই সোহিনীকে সাফল্য এনে দিয়েছে। বলা যায়, গরল সে পান করেছে সত্যি, কিন্তু তা কণ্ঠেই ধারণ করেছে। অন্তরে ছিল তার স্বতন্ত্র মহিমা। তার সম্পর্কে স্বামীর আধুনিক উদার মূল্যায়নের কথা সে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছে :

> ''আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন তাঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনদিন একটুমাত্র নষ্ট করিনি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো, সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়িনি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন।' ১১৮ নিজের প্রতি স্বামীর এই বিশ্বস্ততাই সোহিনীকে এগিয়ে চলার শক্তি বর্ণনা জুগিয়েছে, তাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। আর এভাবেই সে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে পেরেছে।

লক্ষ্য স্থির করে আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে নির্ভয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে সোহিনী। কর্মময়ী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেকে। এ প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র ছিল 'যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই, জিতবই জিতবই'। ১১৯ এভাবে স্বনির্ভর দৃঢ়চিত্তে 'একলা চলার 'নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে সোহিনী উড়িয়েছে জীবনের জয়ধ্বজা। ''পুরুষশাসিত সমাজে সোহিনীই হলো প্রথম নারী, যে পুরুষের কর্মধারাকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। পাঞ্জাবি রক্তের উত্তরাধিকারবাহী সোহিনী চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় নারীর আদর্শে সৃষ্টি করেছেন।'' ১২০ এ কারণেই গল্পগুচ্ছের বিচিত্র নারী চরিত্রের মধ্যে সে হতে পেরেছে অপূর্ব, অনন্য।

সোহিনী নন্দকিশোরের পারস্পরিক সম্পর্কটি ছিল প্রথমত, বিশ্বস্ততার,দ্বিতীয়ত, ভালোবাসার। স্বামীর বিশ্বস্ততাই স্ত্রীকে নিজের শক্তি সম্পর্কে আত্মনির্ভর হতে শিখিয়েছে। নন্দকিশোর যেমন সোহিনীর দৈহিক চরিত্র নয়, নৈতিক চরিত্রের মূল্য দিয়েছে, সোহিনীও তেমনি নন্দকিশোরের এ ঔদার্যকে সম্মান করেছে, শ্রদ্ধা করেছে। বলা যায় স্বামীর এই ঔদার্যই সোহিনীর সকল কাজের মূল প্রেরণা ছিল। স্বামী-স্ত্রীর এই পারস্পরিক সমঝোতা, শ্রদ্ধাবোধ গল্পগুচ্ছে একাধারে এই প্রথম, এই শেষ। বিস্ময়কর হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর এই সংস্কারমুক্ত আধুনিক মানসিকতার কথা রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯৪০ সালেই ভেবেছিলেন! ল্যাবরেটরির যোগ্য উত্তরসূরি নির্বাচনে নিজ কন্যাকেও বিশ্বাস করেনি সে। বলেছে 'ও ভাঙ্গন ধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে আস্ত থাকবে না।' ১২১ তাই ডঃ রেবতী ভট্টাচার্যের ওপর তার দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু যোগ্যতা যাচাইয়ের মাপকাটিতে শেষ পর্যন্ত 'ফুটোপাত্র' হিসেবে রেবতী প্রমাণিত হয়েছে। স্বামীর জীবনের 'খনিখোঁড়া-রক্ত' ১২২ ল্যাবরেটরিকে সে রক্ষা করেছে ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

নীলা-রেবতী সম্পর্ক এ গল্পে একটি স্বাভাবিক এবং অনেকটা সোহিনীর জীবনের সমধর্মী। 'নীলা একেবারে ফুটফুটে গৌরবর্ণ। ------- মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীল পদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।' ১২৩ বোঝা যায়, নীলার সৌন্দর্য অসাধারণ। সেকারণে তার যৌবনের 'জ্বালামুখী অগ্নিচাঞ্চল্যও' ১২৪ দুর্বার। বাবার ল্যাবরেটরি, মায়ের হিতোপদেশ তাকে সংযমী করতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে তারও হয়েছে স্খলন। মায়ের দৃষ্টিতে 'আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।' ১২৫ নীলা মায়ের 'ছোট' দোষটিকে পেয়েছে কিন্তু মায়ের 'বড়ো 'গুণটিকে উপলব্ধি করতে পারেনি তাই 'কামনার তপ্তবাষ্পে' ভস্ম হয়ে গেছে সে; আর সেই সাথে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে রেবতীকেও। রূপাঙ্গের মূঢ়তায়, জৈব কামনার উদাসীনতায় স্নেহময়ী কর্তব্যময়ী জননী -সোহিনীকে চিনতে পারেনি নীলা। বরং সঙ্গদোষের নির্বুদ্ধিতায় উত্তরাধিকারসূত্রে পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করতে চেয়েছে। সে ক্ষেত্রেও নির্ভীক, জননী সততার সাথে ঘোষণা করেছে নীলার আসল পিতৃপরিচয় :

> ''আসল সন্দেহের মূল আরও অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস? এমন লোকের তুই মেয়ে একথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করেনা?'' ১২৬

সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে এই সত্য প্রকাশের দুঃসাহস একমাত্র সোহিনীর মতো নারীর পক্ষেই সম্ভব। মানুষ যাচাইয়ের কষ্টিপাথর ছিল যার বোধে, বিচার ক্ষমতায়, সেই সোহিনীর সাথে নীলার স্বভাবগত মৌলিক পার্থক্যটি গল্পে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের চকিত বর্ণনায়। নীলার জন্মইতিহাসও এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা বাহুল্য হবে না।

> ''মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিম্বা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশ গৌরব, কিন্তু কি একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যা অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করে ছিল পুরুষ মানুষ বলে। নীলার জীবনে কখন্ এক সময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিতনা। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকেনা।নীলার মনে আলো পৌঁছায় না।'' ১২৭

নীলার এই 'হয়ে ওঠার' ইতিহাসটি তাকে করেছে নিয়ন্ত্রিত। আর তার প্রেমিক রেবতীকে স্খলনের পশ্চাতেও সক্রিয় তার মানস -গঠনের ইতিহাস। মাতৃহীন রেবতী সনাতনী পিশিমার পরিচর্যায় প্রতিপালিত। তার স্বভাব, চরিত্র ব্যক্তিত্ব সবই পিশির তর্জনী-শাসিত। এমনকি রেবতীর শিক্ষাজীবনও চালিত হয়েছে পিশির মতানুসারে এবং তা যে রেবতীর জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, শিক্ষক মন্মথ চৌধুরীর বর্ণনায় তার প্রমাণ মিলবে :

Dhaka University Institutional Repository

''আপসোসের কথা কি আর বলব। ----------রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজে যাবে স্থির হলো, আবার এসে পড়ল সেই পিশিমা হাউ-হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস , ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, না হয় করল বিয়ে,। সর্বনাশ! কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে; 'ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। ---------- ব্যস্ এখানেই খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।'' ১২৮

এই ভাবে পিশিমার আঁচল------ এর ছায়া তার মনোজগত এবং ব্যক্তিজগতকে আবৃত করে রেখেছিল। নীলার নিখুঁত দেহের গঠন দেখে তার রক্ত প্রবাহ চঞ্চল হয়ে ওঠে, উপেক্ষা করতে পারেনা কোনমতে। আবার তাকে গ্রহণও করতে পারেনা, হাতের মুঠো শক্ত করে নিজেকে সংযত রাখতে চায় সে। মনের স্বাভাবিক গতির ওপর অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ তাকে অধিকতর দুর্বল করে তোলে। তার ওপর জাগানী ক্লাবের পারিষদবর্গের স্বার্থান্বেষী ফাঁপা প্রশংসা তাকে আরও পৌরুষহীন করে তোলে। তার এই মানস পরিচয় মেলে সুন্দর উপমা-বর্ননায়: 'রেবতীর মনে হলো এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।' ১২৯ বস্তুত এখানে রেবতীর পরিণতি আভাসিত হয়েছে। পিশিমার নির্দেশ অমান্য করবার সাধ্য তার নেই। সেখানে নীলা, তার ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ সব পেছনে পড়ে থাকে। এই দুর্বলতার সুযোগটিই নীলা লুফে নিতে চেয়েছিল। ''পান্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে-তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই।' ১৩০ রেবতীর ব্যক্তিত্বহীনতাকে, পৌরুষহীনতাকে কৌশলে ব্যবহার করতে চেয়েছে নীলা আপন স্বার্থে। সেই কৌশলই তাদের জন্য ফাঁদ হয়ে ধরা পড়েছে। নিজেদের বিস্তারিত জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়েছে। গল্পের শেষেও তাই পিশিমাকে অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না রেবতীর।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. রফিকউল্লাহ খান, রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, কথা সাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব, অনন্যা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ.১৬

২. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়,কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৭৯

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৪০৫, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪০

৬. অশ্রুকুমার সিকদার, যুগলের সিঃসঙ্গতা, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৩, পৃ. ২৭

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৪৭৬

৮. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৭৯

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫৪৪

১০. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৮০

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫৩৪

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৬-৫৪৭

১৩. অশ্রুকুমার সিকদার, যুগলের নিঃসঙ্গতা, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস , পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৬, পৃ. ২১

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫৫৫

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩-৫৫৪

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৫

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫১

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫১

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫০

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৫

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৫

Dhaka University Institutional Repository

২৭. জীবনানন্দদাশ, 'বোধ', প্রকাশিত -অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র, আবদু মান্নান সৈয়দ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত , অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫৫৭

২৯. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৮৬

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫৬৭

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৮

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৮

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৮

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৮

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৬

৪২. হুমায়ুন আজাদ, দ্বিতীয় লিঙ্গ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ.১১৩

৪৩. অশ্রুকুমার সিকদার, যুগলের নিঃসঙ্গতা, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পূর্বোক্ত , পাদটীকা নং ৬, পৃ. ৩২

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫৮৯

৪৫. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং২, পৃ. ১৮৯

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫৮৯

৪৭. অশ্রুকুমার সিকদার, যুগলের নিঃসঙ্গতা, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৬, পৃ. ৩২

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫২৭

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৯-৫৯০

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯১

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯০

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯১

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৩

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৯

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৯-৬০০

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০০

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০১

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৬

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৬

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৬

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৫

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১১

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১২

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১২

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮৭

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৬১৩

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৩

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৩-৬১৪

৭০. ভীষ্মদেব চৌধুরী আনন্দী-মৃণাল-অনিলাঃ সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা ,উনবিংশখণ্ড, জুন, ২০০১ পৃ. ১৫

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৫৪৮

৭২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, আনন্দী-মৃণাল-অনিলাঃ সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান, পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ৭০, পৃ. ১৬- ১৭

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৬২৫

৭৪. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ১৯২

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৬২৫

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. ভীষ্মদেব চৌধুরী, আনন্দী-মৃণাল- অনিলাঃ সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৭০, পৃ. ১৭

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৬৬৩

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৩

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৪

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৫

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৬

৮৯. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, কলিকাতা নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১৯৪১, পৃ. ৩৮২

৯০. রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৬৭৫

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৭

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৭

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৯

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮১

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮১

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮১

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮২

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৩

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮২

১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৮

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৪

১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৮

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯০

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯১

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯১

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯১-৬৯২

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯১

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯১

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯১

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৩

১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৫

Dhaka University Institutional Repository

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৬

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০২

১১৪. ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্পঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা ং ২, পৃ. ২৫৪

১১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত,পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৭১৬

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০২

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১০

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১১

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১৪

১২০. রফিকউল্লাহ খান, রবীন্দ্র-কথা সাহিত্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, কথা সাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১, পৃ. ১৬

১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ পূর্বোক্ত পাদটীকা নং ৩, পৃ. ৭০৬

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১০

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৬

১২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০৬

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২২

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০৪

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০১

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১৮

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১৯

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গল্পগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথের শিল্পিসত্তার শিখরস্পর্শী সাফল্যে উদ্ভাসিত গ্রন্থ। উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামো, এর মন্থর সংস্কৃতির বহমান জন-জীবন এবং বিশ শতকীয় অভিঘাত আত্মস্থ করে রাবীন্দ্রিক শিল্পসুষমায় পুষ্ট এর বিষয়লোক। যাত্রারম্ভ থেকেই সমাজ-সময়ের জীবনপ্যাটার্ন,মানবিক মূল্যচেতনা ধারণ করে আছে *গল্পগচ্ছের* অসংখ্য নর-নারী। যেহেতু উনিশ শকতের প্রায় শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধের (১৮৬১-১৯৪১) সময় পরিসরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান, তাই এই দুই শতকের যুগবৈশিষ্ট্য, সমাজ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারী-পুরুষের মধ্যে স্থিতি লাভ করেছে । একারণে প্রকাশকাল এবং চরিত্রলক্ষণের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পসমূহকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। আলোচনার সামঞ্জস্য বিধানে সে বিন্যাসরূপ আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে:

(ক) উনবিংশ শতকের কালসীমায় রচিত গল্প (১৮৯১-১৯০০)

(খ) বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী গল্প (১৯০১-১৯১৩)

(গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্প (১৯১৪-১৯৪০)

রবীন্দ্র-চৈতন্যের ক্রম-বিকাশ এবং 'ক্রম হয়ে ওঠা'র পূর্ণ ইতিহাস ধারণ করে আছে *'গল্পগুচ্ছ।'*

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্য ভান্ডারের বিষয় গৌরব এবং শিল্পগৌরবের মূল উৎস হিসেবে নির্বাচন করেছেন মানুষকে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচিত্রের মধ্যে দিয়ে তার বহির্বাস্তবতা এবং অন্তর্বাস্তবতার চেতনাস্তর উন্মোচন *গল্পগুচ্ছে,* নারী,পুরুষ সম্পর্ক রূপায়ণের শিল্পময় প্রকাশকে নির্দেশিত করে। উনিশশতকীয় কালসীমায় পূর্ববঙ্গীয় গ্রামীণ সমাজের অবরুদ্ধতা, স্থবিরতা, নারী পুরুষের আবেগ,সংরাগ, বিশ্বাসকে করেছে অবরুদ্ধ, যন্ত্রণাক্লিষ্ট। কালিক প্রেক্ষাপট এ যুগের ব্যক্তি-মানসিকতার মর্মমূলে রোপণ করেছে নিঃসঙ্গতার বীজ। বিশশতকের সূচনাকাল থেকেই এ বীজ অঙ্কুরিত হয়, সম্প্রসারিত হয় এক আধুনিক জীবন অভীপ্সায়, সংকেত-প্রতীকের শিল্পময় বর্ণনায় যা রূপময়। অবরুদ্ধ ব্যক্তিযাতনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তীকাল পরিসরে নারী -পুরুষকে করে তোলে শিকড়-উন্মূলিত, বিশ্বাসবিচ্যুত। রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল ব্যক্তিক মানসিকতার অন্তর্বয়ন এ পর্বের নর-নারীর মধ্যেও হয়েছে প্রতিভাসিত। *গল্পগুচ্ছের* প্রান্তপর্বে, আমরা লক্ষ্য করি আধুনিক যুগলের সুতীব্র নিঃসঙ্গতা, এবং তা থেকে নারীর আত্মঅন্বেষণ, আত্মআবিষ্কার এবং আত্মমুক্তির পথে অভিযাত্রা। রোমান্টিক প্রেম-বিরহ-অভিমান-বিদ্রোহ অথবা প্রত্যাখ্যানের অন্তরঙ্গ অনুভববেদ্যতায় রবীন্দ্রনাথ নারীকে করেছেন কল্যাণময়,সৃষ্টিশীল,বিজয়ী। এ অনুধ্যানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরম বোধ, প্রজ্ঞা এবং প্রাগ্রসরতা যুক্ত হয়েছে।

গল্পগুচ্ছে নর-নারী সম্পর্ক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ মূলত দাম্পত্য প্রেম-অপ্রেমের দুঃসহ অন্তর্ময় অনুভতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের কালিক প্রাগ্রসরতা নর-নারীকে কীভাবে আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত মানসের মনোজৈবনিক দ্বন্দ্বে দীর্ণ করেছে,তারই শিল্পময় অর্ন্তবয়ন গল্পগুচ্ছের নর-নারী সম্পর্কে নিহিত। এই সম্পর্কের পথ বেয়ে তাঁর চরিত্ররা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র, আত্মজাগরিত, ব্যক্তিত্বময়। প্রেমচেতনার সূত্রে প্রেমহীনতা, অবিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ণ, বিষন্নতা প্রভৃতি জীবনচেতনার অনুষঙ্গে আবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও জীবনবোধ এবং শিল্পবোধের যুগল সম্মিলনের রূপ এবং রূপান্তর *গল্পগুচ্ছের* তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত গল্পসমূহে অভিব্যক্ত।

প্রথম পর্বে, ১৮৯১-১৯০০ কাল পরিসরে রচিত গল্প সমূহের অধিকাংশই পদ্মাতীরবর্তী গ্রামীণ জীবন নিয়ে লিখিত। সেকারণে গ্রামীণ নারী-পুরুষ বিশেষত নারী চরিত্রের মধ্যে এক প্রকার সারল্য, সৌকুমার্য দেখা যাবে। উনিশ শতকীয় কলোনী-শাসিত সমাজে পুরুষের অধীনতা, অশিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের করে রেখেছে পুরুষ নির্ভর, অশিক্ষিত, অসচেতন। পাশাপাশি পুরুষেরাও স্বল্পশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত, উদ্যামহীন অথচ কর্তৃত্বপ্রবণ। দাম্পত্য জীবনে দেখা যাবে অধিকতর বয়স্ক পুরুষের সাথে সম্পর্কিত হয়ে শুরু হয়েছে নারীর বৈবাহিক জীবন। সেক্ষেত্রে তাদেরকে বালিকা কিংবা কিশোরী বলাই সমীচীন। এই অসম বিবাহ, বাল্যবিবাহের অনিবার্য ফল হিসেবে এ পর্বের নায়িকারা অধিকাংশই বাল্য বিধবা, জীবন বঞ্চিত কিংবা লাঞ্ছিত,নির্যাতিত। পুরুষের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভূমিকা অধিকাংশ নারীর জীবনকে করে তুলেছে অবরুদ্ধ, দুঃসহ, অসহায়। সেকারণে নারীর অর্ন্তজ্বালা, বেদনা, হিংসা-প্রতিহিংসা, ঘৃণা গল্পের বিষয়াংশে স্থান পেয়েছে। গ্রামীণ পরিপ্রেক্ষিত গল্প বর্ণনায় আবেগময়তা, গীতধর্মিতাকে অনিবার্য করে তুলেছে। আর যে বিষয়টি এ পর্বে নর-নারী সম্পর্কের উন্মেষ-বিকাশ কিংবা পরিণতি ত্বরান্বিত করেছে,নিয়ন্ত্রণ করেছে কিংবা প্রভাবিত করেছে তাহলো প্রকৃতি। প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে এপর্বে নর-নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ রূপলাভ করেছে। গ্রামীণ প্রকৃতি এ পর্বের বর্ণনার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক-উৎস।

দ্বিতীয় পর্বে (১৯০১-১৯১৩) বিশ শতকীয় আধুনিকতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালীন সঙ্কটময় সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্যক্তি মনের জটিলতা এবং ব্যক্তিত্বকে করে তোলে সঙ্কটময়। এসময়ে রচিত গল্পের পটভূমি অধিকাংশই গ্রাম নয়, শহর। বলা বাহুল্য,সেটি কোলকাতানগরী। রবীন্দ্র -মানসের প্রথম পর্বের নারী-পুরুষ সম্পর্ক ভাবনা এপর্বে বিবর্তিত হয়ে যে রূপলাভ করেছে, তার স্বরূপ প্রধানত মনোধর্মী । নাগরিক নারী-পুরুষের বাস্তব জীবনের অনুপঙ্খ বর্ণনার চেয়ে তাদের অর্ন্তজীবনের গভীর, গহন বাস্তবতার অনুসন্ধান, চেতন-অবচেতন মনের কামনা বাসনার রূপায়ণ, এপর্বের নর-নারী সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্য। প্রথম পর্বের চরিত্রের বয়সসীমার তুলনায় এপর্বের নারী -পুরুষ অধিকতর পরিণত। শাহরিক পটভূমির জীবন বলে নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই শিক্ষার প্রসার,কর্ম প্রবণতা দেখা যাবে। প্রাক-বিশ্বযুদ্ধ কালীন সময়ের প্রবণতায় যুগলের মধ্যে এসেছে দাম্পত্য-বিচ্ছিন্নতা। তাই প্রথম পর্বের মতো চরিত্র অঙ্কনের পরিবর্তে এ পর্বে ব্যক্তির আত্মান্বেষণ মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রথম পর্বের নর-নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এ

Dhaka University Institutional Repository

পর্বে আরও তীব্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে নিঃসঙ্গতায় নিপতিত । একারণে মনোকথন রীতির ব্যবহার, নিগূঢ় চিত্রকল্প, সূক্ষ্ম সংকেত-প্রতীক এপর্বের গল্পের শিল্প বৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিশ শতকের রেনেসাঁসীয় জাগরণ এ পর্বের নারী-চরিত্রের মধ্যে এনেছে এক অপূর্ব ব্যক্তিচেতনা যা পরবর্তীকালে আত্মচেতনা কিংবা আত্মমুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পর্বের দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা সবুজপত্র-যুগে এসে কেবল বিচ্ছিন্নতার আবর্তেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বযুদ্ধ-কালীন সময়-সামজের অনিবার্য ভাঙন নর-নারীর জীবনেও ফাটল ধরিয়েছে, যুগলের সম্পর্ক হয়েছে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের মুখোমুখি।

তৃতীয় পর্বে (১৯১৪-১৯৪০), প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক রাজনৈতিকপরিবর্তন,ইউরোপীয় ধনবাদী সমাজের বিকাশ ও উৎকর্ষ, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সাম্যবাদের বিকাশ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির পুনর্বিন্যাস চরিত্রের জীবন ও জীবনবোধকে স্পর্শ করেছে। এসময়ে রচিত গল্পে নর-নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনাস্থা, অবিশ্বাস প্রধান এবং প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। নারী এখানে আর (প্রথম পর্বের মতো) অসহায়, নিরুপায় নয়, এপর্বে তারা বুদ্ধিশাসিত, স্বনির্বাচিত সিদ্ধান্তে অবিচল, দ্বিধাহীন। দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা, দাম্পত্য-নৈঃসঙ্গ্য মেনে নিয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে জ্বাজ্বল্যমান তারা। আত্মসম্মানবোধ এ পর্বের নারী পুরুষকে করেছে আপোষহীন। বিশেষত নারী চরিত্র এপর্বে বুদ্ধি, কর্মে, ব্যক্তিত্বে, কৌশলে পুরুষকে ছাড়িয়ে নিজের জয়ধবজা উড়িয়েছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু পুরুষ চরিত্রও আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। প্রথম পর্বের গ্রামীণ প্রকৃতি এ পর্বে নাগরিক পরিবেশে শীর্ণ, তির্যক, ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। চরিত্রের আত্মকথন, আত্মভাষণের সাথে তৃতীয় পর্বের প্রকৃতি সূক্ষ্ম সংকেতবাহী, অধিকতর তির্যক, শিল্পময়। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান, মেধা চেতনা বিশ্বযুদ্ধ সময় পরিসরে এসে হয়েছে ক্রমশ বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান নির্ভর।

রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষাপ্রিয়তা, *গল্পগুচ্ছে*, নর-নারী সম্পর্কের বৈচিত্রাময়তাকে অবলম্বন করে অগ্রসরমান। সময়-সমাজের পটভূমিতে নর-নারী সম্পর্কের রূপ কীভাবে রূপান্তরিত হয়, তাই *গল্পগুচ্ছের* মৌল অভীপ্সা। নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন ফল্গুস্রোতের মতো আরেকটি নিরীক্ষা চালিয়েছেন।তা হলো নারীর স্বরূপ উন্মোচন। নারীর ব্যক্তিত্ব, তার মনোজগতের আধুনিক নিরীক্ষা, তার জীবনবোধের প্রাগ্রসরতার প্রান্ত। 'সমাপ্তি'গল্পের মৃন্ময়ী চরিত্রের মধ্যে যেমন নারী জীবনের উন্মেষ, বিকাশের পর্বগুলো উন্মোচিত হয়েছে ক্রমানুয়ে, সমগ্র *গল্পগুচ্ছের* পর্বত্রয়ের মধ্যে দিয়েও ঠিক তেমনিভাবে নারী-চরিত্রের স্বরূপ, বিকাশ, বিবর্তন পরিণতি পরীক্ষিত হয়েছে সতর্ক দৃষ্টিতে। এ কারণেই *গল্পগুচ্ছে* নারী চরিত্রের প্রাধান্য এবং ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সমবেদনা মূলত নারীর প্রতিই নিবেশিত হয়েছে । নারীর কল্যাণময়, সৃষ্টিশীল, সহনশীল রূপ রবীন্দ্রনাথকে

Dhaka University Institutional Repository

আকৃষ্ট করেছে, মুগ্ধ করেছে আজীবন। তাই নারীর স্বরূপ অঙ্কনে আত্ম-আবিষ্কার, আত্ম-মুক্তি, আত্ম-প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাঁর-নারী অনুধ্যানের মূল মডেলটি প্রতিফলিত হয়ছে। নারী অনুধ্যানের এ রোমান্টিক অভীপ্সা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও জীবনবোধের মূলে প্রোথিত। নারীর উত্থান-পতন-জাগরণ-বিজয়ের অনুষঙ্গে পুরুষ অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত। পুরুষের সহযোগিতা-বিমুখতা, সম্পর্ক-নিঃসম্পর্ক, প্রেমে-অপ্রেমে দোলায়িত হয়েইে নারী জেগে উঠেছে আপন সত্তায়। *গল্পগুচ্ছে,* নারীর রূপ-রূপান্তরে,তাই পুরুষের ভূমিকাও অবশ্যস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ* মূলত নর-নারীর মনোজৈবনিক কামনা, বাসনা, অতৃপ্তি, দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতাজনিত বেদনার শিল্পভাষ্য। *গল্পগুচ্ছের* প্রতিটি পর্বে নানা সূত্রে দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা এসেছে। নারীর অসুস্থতা,রুগ্নতা, পুরুষকে কখনো কখনো করে তোলে স্ত্রী-বিমুখ। এক্ষেত্রে পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী পরিগ্রহণ পারস্পরিক নৈকট্যকে দূরীভূত করেছে। বন্ধ্যাত্ব কিংবা সন্তানহীনতাও কখনো কখনো দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে উঠেছে। আবার পুরুষের লাঞ্ছনা, উপেক্ষা, ব্যক্তিত্বহীনতা নারীকে বিমুখ করেছে দাম্পত্যজীবনে। পুরুষের ঔদাসীন্য কিংবা কর্মব্যস্ততাও কখনো কখনো নর-নারীর মধ্যে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার জন্ম দিয়েছে। বলা যায়, নারী-পুরুষ উভয়েই গল্পগুচ্ছে প্রায়শই দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য-যন্ত্রণার শিকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ যন্ত্রণা, অতৃপ্তির মধ্যেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে নারী ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে,কর্মমুখী হয়েছে, আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পরম অনুভববেদ্যতায় নর-নারীর হার্দিক জটিলতা, বেদনা-বিষাদময় নিঃসঙ্গতা পৌনঃপুনিক সন্ধান করেছেন।

গল্পগুচ্ছে, নর-নারী সম্পর্ক ভাবনায় রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি আদ্যান্ত স্থির থাকেনি। সমাজ-সময়ের চলমানতায় তার ক্রম রূপান্তর ঘটেছে। নর-নারী সম্পর্কের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষের বর্ণনায় শোনা যাবে। নারীও কখনো কখনো তার লাঞ্ছনা অপমান, উপেক্ষা কিংবা ভালোবাসার কথা তুলে ধরেছে স্বকণ্ঠে। কিন্তু প্রান্তপর্বে গিয়ে পুরুষের ভাষ্যে নারীর অবমাননার কথা উচ্চারণ পুরুষ কর্তৃক নারী-মুক্তির স্বীকৃতিরই নামান্তর । নারীর আত্মজাগরণ-আত্মপ্রতিষ্ঠার শিল্পরূপ সৃজনে প্রান্তপর্বের গল্পগুলো সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যায়, সমগ্র *গল্পগুচ্ছ,* নর-নারী সম্পর্ক সৃজনে-অন্বেষণে-উত্তরণে রূপ থেকে রূপান্তরের পথ পরিক্রমায় এক আধুনিক প্রাগ্রসর চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

নর-নারী সম্পর্ক রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে, *গল্পগুচ্ছের* কোন কোন গল্পে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের আংশিক উপাদান লক্ষ্য করা যাবে। চরিত্রের উচ্চারণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় রবীন্দ্রনাথের মানস-কথন। এই আত্মানুভব কিংবা আত্মনিমগ্নতা গল্পগুচ্ছে নিয়ে এসেছে প্রতীকী মনস্তত্ত্বের ধারণা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নান্দনিক চেতনা। এ কারণেই *গল্পগুচ্ছের* নর-নারী সম্পর্ক অন্বেষণ আধুনিক ব্যক্তি মানুষের কাছে আত্ম অন্বেষণেরই নামান্তর হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

নর-নারীর পারস্পরিক আর্কষণ-বিকর্ষণজনিত প্রেম-অপ্রেম, যন্ত্রণা-নৈঃসঙ্গ্য,বিচ্ছিন্নতা-এগুলো সময় ও সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরেই ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর রোমান্টিক সংবেদনাজাত অনুভববেদ্যতায় তা তুলে ধরতে চেয়েছেন গল্পগুচ্ছের পর্বত্রয়ের মধ্যে। এক্ষেত্রে তাঁর বোধ, প্রজ্ঞান, প্রাগ্রসর চৈতন্য অভিনিবেশিত হয়েছে মানবমনের বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে। . এ কারণে *গল্পগুচ্ছের* প্রতিটি স্তরে নর-নারী সম্পর্ক বিষেশত দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য সমভাবে দৃশ্যমান,তা হলো নিঃসঙ্গতা। তিনটি পর্বেই যুগলের নিঃসঙ্গতা দেখা যাবে,কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অনিবার্যভাবে ফল্গুস্রোতের মতো আরেকটি যে পরিবর্তন ঘটায়, তাহলো মানুষের মনোজাগতিক পরিবর্তন। সেকারণে *গল্পগুচ্ছের* উনিশ শতকীয় দাম্পত্য-বিচ্ছিন্নতা আর বিশ শতকীয় দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান ব্যাপক। মুলত এ ব্যবধান নির্দেশিকরণের জন্য *গল্পগুচ্ছে* পর্বত্রয়ের বিভাজন অনিবার্য হয়ে পড়ে । নিরীক্ষাপ্রিয় স্বভাব রবীন্দ্রনাথকে নর-নারী সম্পর্কের এ রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আর এ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের মৌলবোধ,অভিজ্ঞান,দর্শনের পরিচয় পাই।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মুলগ্রন্থ

গল্পগুচ্ছ : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৫।

খ অন্যান্য রবীন্দ্র গ্রন্থ

গীতবিতান : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৬
চোখের বালি : রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয়খণ্ড, বিশ্বভারতী,কলকাতা, ১৪০২।
চতুরঙ্গ : রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২।
ঘরে-বাইরে : রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা,১৪০২।
শেষের কবিতা : রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চমখণ্ড,বিশ্বভারতী, কলকাতা,১৪০২।
রবীন্দ্র-রচনাবলী : প্রথম খণ্ড, তৃতীয় খন্ড, দ্বাদশ খণ্ড : ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন, পৌষ, ১৪০২।
প্রবন্ধ :
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র : রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথমখন্ড, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পুণমুদ্রণ, ১৪০২।
য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি : রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথমখন্ড, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পুণমুদ্রণ, ১৪০২।
চিঠিপত্র : রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথমখন্ড, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পুণমুদ্রণ, ১৪০২।
সঞ্চয়িতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৬।

গ. সহায়ক গ্রন্থ :
অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস (অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৮৮)
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা (কোলকাতা, ১৯৮২)
আনোয়ার পাশা : রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, প্রথম খণ্ড (স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৩)
আবদুল মান্নান সৈয়দ : রবীন্দ্রনাথ (অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০১)
আবদুল মান্নান সৈয়দ : কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত: জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র (অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৪)
আবু সয়ীদ আইয়ুব : আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (দেজ পাবলিশিং কোলকাতা, ১৯৬৮)
পান্থ জনের সখা (দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৯৭৩)
পথের শেষ কোথায় (দেজ পাবলিশিং,কোলকাতা) ১৯৭৩
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উজ্জ্বলস্রোতে (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা, ১৪০০)
খায়রুল আলম সবুজ(অনুঃ): নোরা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০০।
ক্ষেত্রগুপ্ত : রবীন্দ্র-গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ (গ্রন্থ নিলয়, কোলকাতা, ১৯৯১)
গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প (সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৭)
জগন্নাথ চক্রবর্তী : অস্তিত্ব বিরহ (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কোলকাতা, ১৯৮৮)
জীবেন্দ্র সিংহ রায় : সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় পর্ব) কলিকাতা, ১৯৬১)
নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৯৪১, কলিকাতা)

Dhaka University Institutional Repository

রফিকউল্লাহ খান	:	কথা সাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব (অনন্যা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২)রবীন্দ্র বিষয়ক (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩)
বিশ্বজিৎ ঘোষ	:	নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩)
বুদ্ধদেব বসু	:	রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্য (নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা, ১৯৯৫)
শঙ্খঘোষ	:	ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (দেজ পাবলিশিং কোলকাতা, ১৯৭৩)
সাহিত্য সংসদ	:	সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কলিকাতা, ১৯৯৩)
সৈয়দ আকরম হোসেন	:	প্রসঙ্গ: বাংলা কথা সাহিত্য (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০)
হুমায়ুন আজাদ	:	দ্বিতীয় লিঙ্গ (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮)

ঘ. সহায়ক প্রবন্ধ :

অনীক মাহমুদ	:	''রবীন্দ্রনাথের মানব-প্রত্যয়'' দৈনিক সংবাদ, ২৫শে শ্রাবণ, ১৪০৮, ঢাকা।
ওয়াহিদুল হক	:	''মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশমনি দিয়ো'' দৈনিক সংবাদ, সংবাদ সাময়িকী, ২৫শে বৈশাখ স্মরণে রবীন্দ্র-সংখ্যা, ১৪০৯, ঢাকা।
বেগম আকতার কামাল	:	''উপনিবেশোত্তর নিরিখে রবীন্দ্র-সাহিত্য'' দৈনিক সংবাদ, সংবাদ সাময়িকী, ২৫শে শ্রাবণ, ১৪০৮,ঢাকা।
ভীষ্মদেব চৌধুরী	:	''আনন্দী-মৃণাল-অনিলা: সাদৃশ্য ও পার্থক্য সন্ধান'', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা উনবিংশ খণ্ড, জুন ২০০১
মোহীত উল আলম	:	''কন্যাদায়: রবীন্দ্র-পটভূমি''দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ আগস্ট, ২০০১, ঢাকা।
সনৎ কুমার সাহা	:	''নারীর কথায় রবীন্দ্রনাথ: উপন্যাসে গল্পগুচ্ছে'', দৈনিক সংবাদ, সংবাদ সাময়িকী, ২৫ শ্রাবণ, ১৪০৮, ঢাকা।
		''চন্দরা ও সীতা'', দৈনিক সংবাদ, সংবাদসাময়িকী, ২৫ বৈশাখ স্মরণে রবীন্দ্র- সংখ্যা, ১৪০৯, ঢাকা।